নিচুতলার চিত্রকলা

নিচুতলার চিত্রকলা

রাধাপ্রসাদ ঘোষাল

প্রজ্ঞা প্রকাশন
২০এ সুকিয়া স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০ ০০৯

যারা অন্ধকারে,

আধখানা শরীর এখনো অনালোকিত,

এইসব গল্পের সেইসব কুশীলবদের

উদ্দেশ্যে

নিচুতলার চিত্রকলা :

সকাল

মেয়েটি ঘুমিয়েছিল নোংরা কাঁথায়। আকাশে ছেঁড়া শাড়ির মতো মেঘ ভেসে যাচ্ছে চাঁদের ওপর, নাকি চাঁদই মাছির মতো ভেসে যাচ্ছে দুর্দিনে সে কে বলতে পারে। ঈশান কোণে মেঘচাপা এক কালসাপ যেন পাক খাচ্ছে—এভাবেই বৈশাখ অতিক্রান্ত হয়। মেয়েটির মুখে-চোখে কোথাও কোনো মায়া আছে কিনা, আবছায়ায় তা ঢাকা পড়ে গেছে। বুঝি মাটির মালসায় ঢাকা আছে তরতাজা এক কুটুম পাখি—এইমাত্র ঘুম এসেছিল তার চোখে, গায়-গতরে। ঝাঁটার বাড়ি খেয়ে চোখ খুলল তার, তলপেট থেকে একটা ককিয়ে-ওঠা স্বর যেন নাকের ছিদ্রপথে, —'ঢেমনি মাগী, গায় হাত উঠালি যে খুব।'—মারাত্মক ধারালো সে তেজ, দিশি মুরগির ঠোঁটের মতো তীব্র। এমন সময় শেয়ালদা কোর্টের উলটো দিকের ঠিসারা থেকে পেসাবখানার গন্ধ আসে। লাইটপোস্টের তলায় দাঁড়িয়ে একটা লোক যেন থিতিয়ে-থাকা মদের ডাব্বায় চাটু চালায়। এসবে হামেশাই লোকজনেরা অভ্যস্ত হয়ে আছে। মেয়েটির মা মুখঝাপটা মারে, 'বলি, সন্ধ্যাবেলা ঘুম, গুলো সোগো-মারানির ঝি খাবি কী? চোখে আঙুল দিয়ে বলি—সারাটা দিন পড়ে থাকে ঘুমা না। যত পারবি ঘুমা।'—চোখ রগড়ে উঠে ব'সে মেয়েটি দেখে শেলদা স্টেশনের দিকে লোকসমাগম বেড়েছে। এখান থেকে বরাবর আকাশ দেখা যায় বটে, কিন্তু তা খুবই তুচ্ছ, ক্ষীণ, জীবনের সঙ্গে তার কোনো যোগাযোগ নেই। একটা কুত্তা একা-একা কী মনে করে ভাবুক হয়ে বসে আছে, কে জানে। এই পেসাব-গন্ধের সঙ্গে সংসারের পাঁচমেশালি ঘ্রাণ ছুটে আসে হাওয়ায়। গরমকালে এ হাওয়াটি বড়ো নরম, প্রাণে শরম জাগে ঢের। তবু শহরের আলো কেঁপে-কেঁপে ওঠে, বাসে-ট্রামে যেন অবিরত বমির শব্দ—মানুষের কেবল বিবমিষা। মেয়েটা ফের মাকে

মুখঝামটা ফিরিয়ে দেয়, তা অকথ্য। সে উঠে যায়, টলটল করে শরীর, ধর্ষিতার মতো দুঃস্বপ্ন দেখেছে যেন এমন নাটক। নিষ্ঠুরভাবে নিজেরই অঙ্গপ্রত্যঙ্গ জাগে তার শরীরে, যেন-বা বিছুটি গাছের লতাবিতান, গায়ে পড়লে জ্বালা করে। লাইট-পোস্টের ভেপার ল্যাম্পের নিম্নগামী আলোর নিচে সে দাঁড়ায়। বোঝা যায় পুঁই-সাপের মতো কালো-নীল বর্ণসাংঘাতিক তার গায়ের রঙ। একটা বর্ষায় বা বৈশাখে যা কিছুতেই ফিকে হবার নয়।—রাস্তার গড়ানে মিনিবাস তার রক্তাক্ত রঙ নিয়ে যায়, আবার দৌড়ে-দৌড়ে ফিরে আসে। একটা ল্যাংড়া লোকের মতো যেন দেখায়, মেয়েটি দেখে। অসম্ভব শক্ত পিচবাঁধানো মাটি এই শহরে, কোথাও কোনো রস নেই, গ্রীষ্মে গলে গিয়ে কলঙ্কের মতো ঘন হয়ে ওঠে। একটা ছেলে ফ্লাইওভারের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে ডাকে, 'অ্যাই শালী—।' শীর্ণাতিশীর্ণ তার দেহ। ঝঞ্ঝাবিধ্বস্ত। তার কথায় কেউ কর্ণপাত করে না। মেয়েটির সামনে অন্য একটি মাঝবয়সী লোক এসে মতলবে হ্যা-হ্যা করে। ফাঁকা উড়ালপুলেও অ্যাকসিডেনট বাঁচিয়ে ক্যাঁচ করে থেমে যায় ট্যাকসি। প্রাইভেট কারের ভেতর থেকে একজন বলে ওঠে, 'বাস্‌স্টার্ড।' ট্র্যাফিক পুলিশ হাত বাড়িয়ে পয়সা নিতে গেল বলে ঠিকঠাক সময়মত হুইশেল বাজল না। মেয়েটি এসব দেখে কী করবে, কেননা সন্ধ্যা বইছে উত্তরের হাওয়ায়। এন আর এস মেডিকেল কলেজে জন্মাচ্ছে, মরছে। মেয়েটি ও লোকটির মধ্যে টাকা নিয়ে বচসা হয়, চাকরিফেরত গৃহস্থ লোকেদের বচসা হয় আলু-পটল-ঝিঙে নিয়ে। নতুন-ওঠা আম রোজই হাফ দরে বিকিয়ে যায়।—আট আনার কলাটি কুড়ি পয়সায় কিনে একটি নাদান খোকা বেমালুম খেয়ে যাচ্ছে।

কনস্টেবলটি জিজ্ঞেস করল তার পেটে রুলের গুঁতো দিয়ে, 'নাম ক্যায়া হ্যায় রে?'

ছোকরাদের মতো থুতনিটি বাড়িয়ে ছেলেটি, খোকাটি বলল, 'ভাগোয়ান—'

'কেয়া দেখতা হো—উধার?'

ছেলেটি প্রথমে উশখুশ করে, তারপর অন্ধকার হয়ে ওঠা কালো ডাস্টবিনটার দিকে আঙুল দেখায়। মেশিন পেশাই আখের খোয়া, ভেজা পচা খড়, ন্যাকড়া ছেঁড়া—কত রকমের নোংরা সেখানে। তার মাঝে পড়ে আছে তাজা রজনীগন্ধার মালা আর লাল গোলাপ। বোধহয় অবাক হওয়ার কিছু নেই—এই শহরের অলিতে গলিতে অনেক সময়ই ব্যবহার-করা ফুল দেখা যায়, ভালোবাসার ফুল! একটা কুকুরী তার প্রায় এক ডজন ল্যানডাপ্যানডা নিয়ে চুঁড়ছে সেই ফুলের

চাঁইটিকে। কুত্তাশিশুরা কাঁইকাঁই করছে। —এইসব দেখতে-দেখতে ছেলেটির কলা খাওয়া, এবং রুলের গোঁতা।

এ ভাগোয়ান—কনস্টেবলের গলা ঈষৎ নরম হয়। খাঁকি পোশাকটি তার একেবারেই নিজের মতো। রোজ সন্ধ্যায় সে একবার এসে জিজ্ঞেস করবে, নাম ক্যায়া হ্যায় রে। কিন্তু নাম বিলকুল জানে। খইনি খাবে ডলে-ডলে। তারপর গলা নরম করে বলবে, আরে, মাকে বুলাও—। মা আসবে। তাকে নিয়ে কনস্টেবল চলে যাবে বড়ো পুলের দিকে। ঘরে গিয়ে ঘুম ধরবে না। ঘুম ধরবে না ভাগোয়ানের। ঝুপড়ির ফাঁকের ভেতর থেকে সে একবার নেতাজী সুভাষ ইনস্টিটিউটের দিকে তাকাবে। কলা, আম বা বিরিয়ানি খাওয়ার গল্প করবে চোদ্দ বছরের বোন বাম্মির সঙ্গে। আহা বাম্মি—! ফ্রকের ওপর চাপা দেওয়া নেতানো গামছাটি তখন বাম্মির বুক থেকে পড়ে যাবে, দেখা যাবে দুটি ছোটো কাঁসার বাটি আর কিছুটা ময়লা। সে ঘটাং ঘটাং করে শেলদা প্লাটফর্মে ট্রেন ঢোকার শব্দ পাবে বুকের তলা থেকে। তখনও ভাত ফোটেনি হাঁড়িতে। শুধু রাত আর রাত। কবে যে ফুরোবে এই রাত। পাশাপাশি সবাই চিল্লামিল্লি করছে। খাবারদাবারের গল্প করতে-করতে ষোলো বছরের খোকা ভাগোয়ানকে চুপ করে যেতে হবে কিছুক্ষণ, অনেকটা ভাবার ভঙ্গিতে কিংবা অনিচ্ছাতেই ঘুমিয়ে পড়তে হবে তাকে, যেন আরও বহুকাল দায়ে পড়ে খোকা সেজে থাকতে হবে। যতদিন রাত ততদিন খোকা থাকা, খোকা থাকার সুবিধে যে ঢের।

হাতের চেটোতে খৈনি ফেলে থাবড়াতে-থাবড়াতে কনস্টেবলটি মৃদু ভোজপুরী গায়—রামা হো-হো-হো-হো। তখন তার বিকশিত দন্তপংক্তি দেখা যায়। রোদে সেঁকা দড়ির মতো পাকানো শরীরটায় বৈদ্যুতিক হলুদ আলো এসে পড়লে তার মুখে চোখে জীবনের প্রতি প্রবল টান দেখা যায়। একটি মুখের ওপর তখন বিচিত্র মুখচ্ছবি।—থু থু করে থুতু ফিকতে-ফিকতে আসে বাম্মির মা, গতরে মাংস ঢের। কিন্তু চোখমুখে অপারগ একটা আঁকাবাঁকা।

'দের কাহে?'

অনুনয়ে কনস্টেবলের গলাটা মোলায়েম। ঠাণ্ডা। কখনও কুত্তার মিউ, কখনও গর্জায়। শয়তানের সঙ্গে যুঝতে তোমাকেও শয়তান বনতে হবে। আবর্জনার মতো রাস্তায় যারা পড়ে থাকে তাদের পেটে রুলের গুঁতো পড়ে মাঝরাতে। ঘুম ধ্বংস হয়ে যায়। ইতর লোকজনদের কাছে নম্র গলায় উসব লোক কখন কথা বলে!—বাম্মির মা, অপরাজিতা ফুলের মতো তার গায়ের রঙ।

লাইটপোস্টের এই আকাশতলায় দাঁড়িয়ে থাকা সেই মেয়েটি খিলখিল করে হেসে উঠল। এমত খিলখিল সে সারা দিনে বহুবার করে, করতে হয়। বোধশক্তি তার স্থূল দেহটাকে তাৎপর্যপূর্ণ করেছে। সর্বময় হয়ে জেগে ওঠা তার তিমির হাড়গুলি ঠোকাঠুকি করে বাজে। ক্রেতারা ভাবে হাসি। হায় হাসি! এভাবেই বহু-বহু কালের বাসি মাংসও চমৎকার বিকিয়ে যায়। তার দরে পোষায় না। সে নিজেকে সান্ত্বনা দেয় না, ইস্পাতের মতো বাঁকিয়ে ধরে কোমরের ছিলা। অন্তু একটা পুরুষ মানুষ, এদের কোনো নাম থাকে না। পরিচয় থাকে না—এরা শুধু খুকখুক কাশে। এদের কোনো রোগ আছে কিনা বোঝা যায় না। মেয়েটি বলে, 'বুঝেছি। এখন খিদে পায়। চলো, ওই দোকানে কচুরি খাই।'

দুজনে হাওয়ায় শুকনো পাতার মতো স স শব্দ তুলে চলে যায়। উনুনে আগুন দপ করে। কড়াইয়ের পিঠ ঝলসে যায়। শ্লা এভাবেই কচুরি গরম হয় পৃথিবীতে। লোকজন চুপ করে আছে। কখনও গশগশ করেছে। ট্রানজিস্টার বাজছে। দূরে প্রেমিকাটি বাস টার্মিনাসে, সালোয়ার কুর্তা কোমর থেকে ক্রমশ সুড়ঙ্গপথের মতো তার পায়ের কাছে এসে শেষ, এটাকে প্রণাম বলা যাবে না, সে অন্য ক্রিমপালিশ মুখ তুলে শিক্ষিত প্রেমিককে বলল,—কী বলল শোনা গেল না। তবু জানা কথা—রাজি হয়ে যাচ্ছ না কেন? কুমড়ো-আলুর ঘণ্ট দিয়ে, কচুরি খায় মেয়েটি। লোকটি চোখে চোখে খায় যেন রক্তফুল-ভাজা। রাত বাড়ে, নানা কিছু ঘটে এই শহর কলকাতায়, ইটখোলায়। মেয়েটি তাকিয়ে দেখে সেই বুড়িটি গাড়ু হাতে ঠকঠক করে আসছে।

মেয়েটি চোখ মটকে বলে, 'খেপি।' —লোকটি গল্প থামিয়ে দেখে অন্ধকারের মধ্যে বুড়িটা ঢুকে গেল। মেয়েটি জানে খেপির হাতে গাড়ুতে আছে জল। সে সোজা চলে যাবে শেলদা সাউথ প্লাটফর্মের দিকে। বছর কয়েক আগে সেখানে ভরসন্ধ্যায় একটা মার্ডার হয়েছিল। রক্তধোয়া সিমেন্ট-বাঁধানো সেই চাতালটি তারপর থেকে রোজ রাতে ঘষে-ঘষে ধোয় খেপি। বুড়ি বুঝি খেয়ালে রাখে না, তারপরেও অনেকগুলি মার্ডার ঘটে গেছে এই কলকাতায়। ঘরে বাইরে। ফুট-পাথে। এবং তা সংখ্যাতীত। দূরে কোথাও বসে পড়ে বুড়ি ঘষে-ঘষে ধুচ্ছে, সেই শব্দ যেন মেয়েটির কানে আসে ঘশ ঘশ করে! লোকটার কাছ থেকে আরও দশটা টাকা হাতায় মেয়েটি। লোকটি বোকার মতো, মাঝে-মাঝে পুরুষরা এমন হয়। কে কোথায় রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইছে অন্ধকারে সে কী যন্ত্রণা। বুঝি কশ নামে এই লোকটার ঠোঁটে। দরে পোষায় না মেয়েটির। সে উঠে গিয়ে দাঁড়ায় ফের লাইট-

পোস্টের নিচে। এমনভাবে কথা বলে এল, যেন তার গলা শ্লেষ্মায় জড়িয়ে গেছে।

তখন এদিককার ফুটপাথ প্রায় চিত হয়ে শুয়ে আছে। মিটিমিটি হাসে মেয়েটি। তার কালো মুখে যে রহস্য খেলা করে তাকে জীবিকা থেকে টেনে আনা হয়েছে। তীব্র সুখ বা অসুখ কোনো কিছুই নেই তার। লাইটপোস্টের নিচে যে অপেক্ষাটি তাকেও যেন কখনও কখনও দীর্ঘ মনে হয়—কখন সকাল হবে। —তারপর লোডশেডিং এই কলকাতায়। তখন ফরফর করে হাওয়ার মতো মানুষদের যাতায়াত। কেউ কি ঝগড়া করছে কোথাও। দেখা যায় বামির মাকে, কনস্টেবলটা তাকে জোর করে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। তুলে নিয়ে যাচ্ছে। একটু ক্ষীণ চাঁদ তখন আকাশের তলায়। মেয়েটি তার চুলে হাত দিয়ে যেন অন্ধকার টের পেল। আরেকটা লোক আসছে তাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে। দেখা যাক যদি রফা হয়।

বুড়িটা কি চাতাল ঘষতে-ঘষতে বিলাপ করছে নাকি। লোকটা এসে বলল, তারপর—খবর কী—অ্যাঁ।

এই সন্ধ্যায় লোকটা তৃতীয় লোক। প্রথম দুটির চেয়ে একটু আলাদা হতে পারে। দেখতেও। স্বভাবেও। সে এসে লোকটির হাত খপাত করে ধরে ফেলল। বলা নেই কওয়া নেই—কেমন বেকুফ কাজ। তবু প্রতিবাদ নেই, মেয়েটা তুখোড়। আখ খেয়ে-খেয়ে সে তার কথাকে কী যে ভীষণ মিষ্টি করেছে! কঁ কঁ করে উঠল লোকটা। বুঝিবা তার কথার ধরন। কেমন আছে খোঁজখবর নিচ্ছে। এদিকে ফুটপাথ, ঝুপড়ি, যেন-বা ঝিল্লিমুখর শহর নীরব হচ্ছে। লোকটা বলল, 'মা কালীর দিব্যি—'

মেয়েটা বলল, 'গরম সিঙাড়া হবে?'

বেলেঘাটার দিক থেকে কেমন একটা হাওয়া ভেসে আসছে। বুড়িটা ধুচ্ছে,—ধুচ্ছে, ধুইয়ে ঘসছে। অনন্তকাল থেকে রক্তপাত আর জলপতনের শব্দ। কে যেন ইনিয়ে-বিনিয়ে কাঁদে। কী যেন বুকের ভেতর ব্যথা অনুভব করে। ছোটো বড়ো অসংখ্য পাখি উড়ে বেড়ায় স্মৃতিতে। রাত্রির ঢালে গড়িয়ে-গড়িয়ে স্মৃতি যে শুধু স্বপ্ন হয়ে যায়। —তবু দরে পোষায় না।

বামির তো চোদ্দ বছর বয়স। মাত্র চোদ্দ। জ্বর হলে গা গরম করার পর্যাপ্ত কাঁথা নেই তাদের। রাতে-টাতে হুটহাট এসে কনস্টেবলরা তুলে নিয়ে যায় তার মাকে।

তখন দূরে কোনো গাছ বা বৃক্ষের পাতা কাঁপে। তা স্পষ্ট দেখা যায়। বাড়নসার দেহে যেন ঝোড়ো কোনো গাছের তান বাজে। নানা চিন্তা তার মাথায় জট পাকায়। নতুন-নতুন চোখে তাকায় লোকজন। দাদাটা পড়ে-পড়ে ঘুম মারে। লোভ দেখায় কত লোক। ভালো-ভালো খাবার খেতে ইচ্ছে করে বামির। পায়ে-পায়ে পিঁপড়ে উঠে গিয়ে কামড়ে চাকা-চাকা ফুলিয়ে দেয়। চিঁ চিঁ করে ইঁদুর ছোটে, কোন্‌দিক থেকে কোন্‌দিকে। হাঁড়ি উল্টে বামি দেখে ভাত নেই একটি দানাও—রাক্ষসীটা খেয়ে গেছে, মা না আরও কিছু! ছেলেমানুষের মতো কান্না পায় তার, অথচ সে তো বড়ো হয়েছে। ঘুম ধরে না। খারাপ লাগে। সকাল হয় না কিছুতেই।

পেসাব পায়। ভাগোয়ান ঘুমে কাঁদা। এই পরিবেশ থেকে বাঁচানোর জন্য তার মা রাতে কখনও একা উঠতে দেয় না। একবার বামি ভাবে দাদাকে ডেকে তুলবে, ডাকতে যাবে এমন সময় একটা কালো বিড়াল এসে বসল পায়ের কাছে। কাঁচা টাকার মতো তার চোখ জ্বলছে। পেটটা গুলিয়ে উঠল ভেতর থেকে। যেন অন্ত্রে-অন্ত্রে জ্বালা ধরল। এখন রাত পাক খাচ্ছে রাতের ভেতর। মায়ের ওপর রাগ লাগে বামির। রোজ তাকে চলে যেতে হয়। সে যাবে, ভালো-ভালো খাবে আর মেয়েকে সে শুধু শাসন করবে। ভালো থাকার জন্য বুকনি দেবে। ···তরি নেই, তরকারি নেই। শুধু ভাত গেলো। তলপেটটা টনটন করে বামির। সে উঠে পড়ে। বাইরে এসে দেখে চাঁদের ওপর দিয়ে কাক বয়ে যাচ্ছে। পেসাবের গন্ধ এসে ঢুকে যায় নাকে, নাড়িতে একেবারে অন্ত্রগহ্বরে। ভেতর থেকে ওয়াক করে বমি বেরিয়ে আসে। অন্তরস্থল হু হু করে। সারা শরীর গুলিয়ে-গুলিয়ে ওঠে। কঁকিয়ে-ওঠা এক শব্দ উদ্‌গীরণ করে সে। চোখের গভীর থেকে জ্বালা বেরিয়ে-বেরিয়ে প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়। রাস্তাঘাটে কুকুরজন্মের ছাড়পত্র আছে বলে কয়েকটি কুকুরকে এখন দেখা যায়। অবাক হয়ে এই উঠন্ত বয়সের মেয়েটিকে দেখছে তারা। ঝুঁকে থাকার দরুন বামির গলার দিক দিয়ে ফ্রকের ভেতর থেকে ঠেলতে-ঠেলতে বেরিয়ে আসা শারীরিক জ্যোৎস্না দেখা যায়। বড়ো সাধু এই জ্যোৎস্না। ···গঙ্গা-ঘাটের পলিমাটির মতো নরম। বাইরের থেকে এর ভেতর বোঝা যায় না, আবার ঢুকতে পারলে ভেতর থেকে বাইরের জগৎকে অজানিত মনে হয়। একটা তীব্র অস্থিরতায় মেয়েটা কেমন শিপশিপ করে কাঁপছে। ভেতর থেকে মুখ বেয়ে তার বেরিয়ে আসছে গরল স্রোত।

ওই মেয়েটি যেন জীবন্ত নয়। কোনো একটি পাথরের স্ট্যাচু—তাই সারা রাতই পোস্টের তলায় দাঁড়িয়ে, কখনও একা, কখনও দোকা। তাকে কেনার মতো টাকা আজ বুঝি কারও নেই এই শহরে। এদিকে সকাল আসছে। আকাশ ফেটে-ফেটে, রক্তশিরা দেখা যায় দিগন্তের গায়ে। এখনও রাত আছে তবু ফুটি-ফুটি, এখনও ফুলের অপেক্ষায়। কিছুটা শ্লথ হাওয়া শুধু ছোটাছুটি করে, ভোরের বাষ্পাচ্ছন্নতায় হিম, কেউ-কেউ চেঁচায় কোনো দিকে। রাতচরা পাখির গায়ে যে শেষ নিশাটি নামে তা মেয়েটির দেহে সঞ্চারিত হয়। সে সত্যি-সত্যি কারও প্রতীক্ষায় থাকে।

অল্প লোকজন এখন জেগে, বিচিত্র রাগে তারা যেন কাকে শাসায়। খাল-পোলের দিক থেকে শুয়োরদের দাঙ্গা ভেসে আসে। হঠাৎ চারজন লোককে এদিকে আসতে দেখল মেয়েটি। চতুর্দিকে ঘুমিয়ে আছে সবাই, কিন্তু কেউ-কেউ জেগে আছে এই একটা ভরসা। তাদের হাঁটার খশখশ শব্দ হয়। ভয় লাগে না মেয়েটির। তা তো কবেই নষ্ট হয়ে গেছে। লোকগুলি কাছে এলে বোঝা যায় এরা অন্য জগতের। —না। তবু সামনাসামনি এলে তারা চোখ তুলে দেখল খারাপ মেয়েটাকে। হাওয়ার মতো ত্বরিতে বয়ে যায়। শোনা গেল খনখনে শব্দ। গলার আওয়াজ। হসপিটালে রোগী মরছে—তারা ট্যাকসি পায়নি, সন্ধানে ছোটাছুটি করছে—প্লাজমা দরকার। রক্ত চাই। বাঙুর কিংবা পি জি যেতে হবে। কিন্তু ট্যাকসি মিলছে না এই শহরে। কলকাতায়। তারা পাগলের মতো, কেউ আছে তার কাছে যে মরছে,—শেষবেলায় তার কাছে থাকা উচিত। এমন সময় আবার একটি লোক এসে মেয়েটির হাত ধরল খপ করে। পৃথিবীর সব পুরুষরাই যেন একই ভাবে ধরে। মেয়েটি বলে, 'না।'

লোকটি তীব্র। সে বলে, 'দুর শালী—'

আরও দুটি লোক আসে। টানাহিঁচড়ে করে, আকাশপটে আগুন জ্বলতে থাকে। মেয়েটি চিৎকার করে ওঠে, 'উরি বাপ্‌রে'—

আরও দুটি তিনটি সাকরেদ আসে, এ যেন নারায়ণী সেনা,—শেষ হয় না। মেয়েটিকে কোলপাঁজা করে তুলে নিয়ে যেতে চায়। সবাই মিলে খাবে। যেন সবুজ কাঁচা আম, নুন ঢেলে খেলেই হলো। জনাকয়েকের ভেতর যে মাতব্বর সে লুঙ্গির গিঁট বাঁধতে-বাঁধতে আঙুলে করে শ্লা অশ্লীল শব্দ করে। মেয়েটি আবার চিৎকার করে অজ্ঞান হয়ে যাবার ভয় দেখায়। এরা রস খাবে মুফতে। পয়সা ঢালবে না। ছটপট করে লোকগুলি। ধস্তাধস্তি চলে। 'মাগীর তো বড়ো টেংরির জোর।'…

চকিতে সামনে এসে দাঁড়ায় একটি ট্যাকসি, 'এই যে দাদা, এখানে ওষুধের দোকানটা কোথায় বলতে পারেন, মেডিকেল শপ ?'—

ট্যাকসির ভিউফাইনডার গ্লাস নেমে গেছে অতলে। ভক্-ভক্ করে মদের গন্ধ, 'ওটা ?'

মেয়েটি বলে ওঠে, 'এই যে দেখুন না—এরা আমাকে তুলে নিয়ে যেতে চাইছে'—

সে কথায় কারো কিছু যায় আসে না। ট্যাকসি উড়ে যায় মাছির মতো। কিন্তু ধস্তাধস্তি-চিৎকার-চেঁচামেচিতে শেয়ালদা স্টেশনের দিক থেকে কয়েকজন হাঘরে দৌড়ে আসে, কী হলো-কী-?-কী হলো-? কী হলো ? মেয়েটির পক্ষ নিল বুঝি—ঝড়ের মতো নয়ছয় চলল, কেউ থাকল। তারই মাঝে একজনের মাথা ফেটে কিছুটা রক্ত পড়ল মাটিতে। শুধু শুধু অপচয়! রেল পুলিশ আসতেই দৌড়াদৌড়ি—সব ভোঁ। কোনদিকে ফাঁকা হয়ে গেল।

তখনই বামি বমি করছে। তার মা ফিরে এল। মাতাল কনস্টেবলটা ছেড়ে দিয়ে গেছে আগে। মেয়েকে বমি করতে দেখে বিলক্ষণ কু গাইল তার মন। তরসতরি সে বলে উঠল, 'ছিনাল মাগী, কোথায় ঢলাতে গেছিলি—কে করল, এই দশা ?'

মেয়েটি আকাশ-পাথর-জল একসঙ্গে, ঘাস-মাটি-পৃথিবী আর জগতের গর্ভস্থিত সম্পদমালা যেন বমির মতো উগরে দিচ্ছে।

'আমি থাকি সাবধান সতর্কে, তুই কিনা সেই···বল্ না লো কে ? কোন্ হারামজাদা ?'

হলুদ নীল লাল পাঁচ রকমের জল নেমে আসছে মেয়েটির অন্ত্র থেকে। সে কী বলবে। জীবনের এখানে কোনো পৃথক মূল্য নেই। ভাগোয়ান ভাইটি তার ঘুম থেকে জেগেও অকাতরে পড়ে-পড়ে ঘুম দিচ্ছে। দেবেই তো। সে জানে শিবরাত্রির দিন কনস্টেবলটি যখন তার মাকে তুলে নিয়ে তারকেশ্বরে শিব দেখাতে গেল তখন—এভাবেই তো সে কলা খায়। খোকা থাকে। হাতে পয়সা আসে। কিছুতেই সকাল হতে চায় না। শুধু আঁধার বদল হয়।

এরপর চরাচরের বিচিত্র রূপ শুধু পৃথিবীর গায়ে একে-একে ধরা পড়ে। সবকিছু একটি পরিপূর্ণ সকালের দিকে যেন ছুটে-ছুটে যায় :

১. মেয়েটি ফিরে যাচ্ছে তার ঘরে। দরে পোষায়নি। মা তাকে মুখ ঝামটা

মারবে। হয়তো-বা ছেঁড়া কাঁথায় ঘুমতে গিয়েও কারও জন্য অপেক্ষা করতে হবে তাকে। অর্থাৎ সে মানুষ, আশাটি তার এখনও বেঁচে আছে।

২. যেন কোনো কিছুই জানে না এইভাবে খোকা ভাগোয়ান ঘুম থেকে উঠে পা টিপে-টিপে বেরিয়ে আসে। তখন পরিষ্কার সকালের দিকে কলকাতা। সে যেন কলকাতা ধোয়ার কাজ দেখতে যায়। বহুকাল আগে হোসপাইপ ঢেলে পথঘাট ধোয়া হতো। গল্পে শুনেছিল। হঠাৎ বুড়িকে দেখতে পায়। সে ধুচ্ছে, খোকা দৌড়ে গিয়ে বলে, জল লাগবে, জল ? এনে দেব ?

৩. কনস্টেবলকে দিনের আলোয় এখন আর দেখা যায় না, বুঝি সে তার সংসারে।

৪. বামির মা ভেবেই পেল না লোকে যে তুলে নিয়ে যায় তাকে, কিন্তু অবাক ভাবে তার চোদ্দ বছরের মেয়ে বামির কী করে পেট হয়ে যায় ?

৫. অপসৃয়মান এই শহর, বামি স্থির, কথা বলবে না সে। যেন চলৎশক্তিরহিত একটি নীরব, নীরবতার প্রতীক।

৬. মারপিটের পর কোথায় ছিল বুড়ি। সে দৌড়ে এসে গত রাত্রের তাজা রক্ত ঘষে-ঘষে তাতে গাড়ুর জল ঢেলে ধুচ্ছে। ফোঁটা-ফোঁটা রক্ত যা মাটিতে পড়ে আছে তাকে বুঝি রক্তফুল বলেই মনে হয়। সে খেপি। সে ঘষে-ঘষে মার্জনা করছে, ভাবছে ময়লা উঠে যাবে। আরে, দুর-দুর, তা কখনও হয় ?

একটি টাকা ও সংলগ্ন গপ্পো

জড়ের মধ্যে ঝড়, পথের মধ্যে জল সে কোনদিকে তাকাবে বুঝে পায় না। কোথায় দাঁড়াবে—নৈঃশব্দ আর অন্ধকারের মাঝে খুটখুট পায়ে মানুষেরা ঘুরে বেড়ায়। কখনো কারো ভঙ্গি সন্দেহজনক লাগে। বুদ্ধের মতো চুপচাপ সমাহিত দাঁড়িয়ে থাকে গাছ, পাতাগুলি নিস্পন্দ—সে যেন অনুভব্য কোনো-কিছুকে বুঝতে চায়। মাঝে-মাঝে চক্কর খেতে খেতে হাওয়া ঘুরপাক খায়, মাটিতে পড়ে ফের উঠে যায় মাথা চাড়া দিয়ে,—'সনাৎ' শব্দটি শোনা যায়। সে টের পায় নানান গন্ধ—মোলায়েম ওষুধের গন্ধ। ঝড়ের মাঝে পড়ে সে গন্ধেও যেন ফাটল ধরে। তবু বুকের ভেতর গুনগুন করে গায়, কে গায় তা সে জানে না। শুধু অদ্ভুত তীব্রতায় একটা কিছুকে অনুভব করার চেষ্টা করে। নাকে এসে লাগে ডিজেলের গন্ধ—জন ও যান চলাচল করে পথে। তারই মাঝে পড়ে আছে নিবিড় দুঃখময় কোনো শূন্যতা—তা তার চোখ দেখে বোঝা যায়। ঘামের মতো ক্লান্তি গড়িয়ে পড়ে তার কপাল, পিঠ কিংবা ছাতি বেয়ে। অসংলগ্ন ঘাসের উদ্ধত রোমরাজি বুকে. তবু ঘন-বুনটের এই সম্পর্কটাকে কেমন যেন আলগা মনে হয়। লোকে যখন হাঁটে, ঘোরে, পায়চারি করে সে তখন অন্যমনস্ক পা টেনে টেনে যায়। কোনো একটি উরগ প্রাণীর মতো বুক ঠেলে ঠেলে। সে কখনো-বা টের পায় তার সর্বাঙ্গে মৃদু ঘুম চারিয়ে যায়। ছড়িয়ে যায়। সাধারণত কম কথার মানুষ, যখন ঘুম আসে তখন সেই অচেতনের মধ্যে পার হয়ে যায় নানা দৃশ্যকল্প স্বপ্নতন্তুজাল, মনপবনের গান। এই সময় সে হাসে। তীব্রভাবে কেশে দিলে সবকিছু ফিকে হয়ে যায়। তখন চারদিক থেকে তরতর করে উঠে আসে রোদ। আহা নরম রোদ—মুগের ডালের মতো শরীরে পড়ে পিছলে যায়। চোখে হাত লাগিয়ে সে টের পায় বাসি ভাতের মতো এক খণ্ড

চোখের কোণে ফুটে উঠেছে। তখন জলকণা শুষে নিতে চায় তার জিভ। বড়ো বড়ো পা ফেলে কিছুটা এগিয়ে যায়। কিন্তু কোন দিকে যাবে ঠাওর করা যায় না। রাগে মাথার ভিতর ফিঙে পাখি শিস দিতে-দিতে থেমে যায়। ভালোবাসার কথা একেবারেই মনে পড়ে না—যাবতীয় ভিন্ন চিন্তা শুধু আত্মাকে ধ্বসিয়ে দিতে চায়। ধ্বসিয়ে দেয়। দাঁড়িয়ে থেকে থেকে সে নিজের ভেতরই যেন ধপ করে বসে পড়ে। সে শব্দ নিজে ছাড়া আর কেউ পাবে না। আকাশ ভরা রোদের নিচে দাঁড়িয়ে যাবতীয় স্নায়ুগুলি চাপা কান্নায় কঁকিয়ে উঠবে। কিন্তু জল ঝরাবে না—কেননা আকাশ অবিরত ঝরিয়ে যাচ্ছে জল এতকাল ধরে। খাপছাড়া রোদ কেমন একটা খামখেয়ালের মতো। খুব ঘন হয়ে ভাবতে গেলে এসবের কোনো মানে খুঁজে পাওয়া যায় না। গভীর থেকে উঠে আসা দীর্ঘশ্বাস চাপল সে। দেখল সকাল ধীরে ধীরে ফুরিয়ে গেল। সময় এখন কিছু-বা শিথিল। তবু লোক হাঁটিহাঁটি করে, কোনো কিছু চিনে ফেলতে চায়। সদ্য স্নান সেরে আসা সাবান ধোয়া কোনো যুবতীর মৃদু গলায় যেন সে উচ্চারণ করল, 'এক টাকা'। এত নম্র গলা সচরাচর সে কখনো শোনেনি, বোধহয় স্মৃতির ভেতর থেকে নড়ে ওঠা শব্দ এত নরম হয়, শব্দটা কেমন সম্পর্কহীন —একা। কত গম্ভীর অথচ নির্ভার। দিনের দ্বিতীয় হাওয়ায় কেমন দুলতে দুলতে বেলগাছিয়ার দিকে চলে গেল শব্দ। আর জি কর হসপিটালের দিকে। বুদ্ধের মতো স্থির হয়ে থাকা সেই গাছ এখন পায়েসের লোভে কন্যা পৃথিবীর দিকে লোভের পাতা ছড়িয়ে দিল যেন। ছাগলে কি না খায়, পাগলে কি না ভাবে। ভোঁতা হয়ে থাকা দুঃখগুলি একা একা তীক্ষ্ণ হয়—এইভাবে সময় কাটে। বেলা বাড়ে কলাগাছের মতো—পার্থক্যটা শুধু এই, এখানে কোনো সবুজের উপমা থাকে না। ট্রাম, বাস, ট্যাক্সি, মোটর এসবের পাশে সে একা একা বসে থাকে। বসে থাকা উচিৎ কিনা ঠিকঠাক করতে না পেরে অনেক সময় দাঁড়িয়েই পড়ে। তখন হাত পায়ের গাঁটে খট করে শব্দ হয়—ভাঙে না, জোড়া লাগে। সে আবার হাঁটতে থাকে, অপরিসীম দূরত্ব ধীরে ধীরে পরিসীম হয়ে আসে। একটি মেয়ের চমৎকার সাদা পা দেখে সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে—লম্বা রোগা কালসিটে পড়া তার হাত, অবয়ব। মেয়েটা হাঁটুর কাছে শাড়ি তুলে এনে জল পেরচ্ছে। এখন তো রীতিমতো দুর্যোগ। আকাশের দিকে তাকিয়ে সে স্পষ্ট দেখতে পেল মেঘ মেঘবাহিনী মেঘসকল কৃষ্ণ সর্পের মতো জোরালো, জমাটবাঁধা রক্তের মতো ঘন—শরীর থেকে সব আকাশে উঠে গিয়ে যেন ছড়িয়ে গেছে। টপ টপ করে ফোঁটায় নেমে এলো আকাশ থেকে. মেয়েটার ছাতায়, এর ওর বাড়ির গায়ে মাথায় ঢিল পড়তে লাগল। সে বলল,

'এক টাকা'। মেয়েটি ব্যাগ থেকে বার করে এক অবিশ্বাস্য হাতে তার হাতে ফেলে দিল একটি সীসার কাঁচা মুদ্রা। মেঘাচ্ছন্ন সেই থমথমে অন্ধকারের মধ্যে মানুষের নিঃশ্বাসের মতোই যেন চকচক করে উঠল ধাতু! মেয়েটা আড়চোখে একবার তাকাল। দানে মতি মেয়েমানুষের জন্য ভালো লক্ষণ। সেই সুলক্ষণা আস্তে আস্তে ব্যানার্জী হাট-মিল্ক কলোনীর মিনিবাসটা তড়াক করে ধরেই ঢুকে গেল। লাল রঙের একটা কুঁচ ফলের মতোই গাড়িটা গড়িয়ে গড়িয়ে শ্যামবাজারের দিকে চলে যাচ্ছে। রসপূর্ণ উথলানো ঘোলাটে শহরের রূপ দেখতে দেখতে সে বুঝি বিহ্বল হয়ে পড়ল। অদৃশ্য আড়াল থেকে নেমে আসা আঁধার ভেতরে খাবি খেতে খেতে তার নিজেকেই কি নিজের কাছে অপরিচিত করে আনল—। —কে বলবে, তা সেই বলতে পারে। তার চোখের তারা কাঁপে—এটা খুশিরই প্রকাশ বটে। হতে পারে বুকের ভেতর দাঁড় টানার ছলছল শব্দ পাচ্ছে সে, ঘুমের ভেতর থেকে তার চৈতন্যলোক হয়তো ধীরে ধীরে জাগরিত হচ্ছে। এই জাগরিত শব্দটির সঙ্গে অঙ্কুরিত কথাটির— খুঁজে দেখলে এক ধরনের মিল পাওয়া যেতে পারে। দুফোঁটা বৃষ্টির জল প্রথমে তার চিবুক থেকে গড়িয়ে গলা টপকে বুকে গিয়ে পড়ল পরে তা আবার নিম্নাঙ্গের সংকেতে হারিয়ে গেল দেহে। অনেকটা গানের মতো সে যেন হারানো রুচি ফিরে পেল। তিরতির করে অচিন সুবাস তার দেহে তত্ত্বের মতো তর্ক করতে লাগল। একটি মাত্র টাকা এখন তার শরীরে লগ্ন আছে, যেন-বা টিউবওয়েলের হ্যাণ্ডেলের মতো শক্ত অলৌকিক কিছু—টিপলেই জল উঠে আসে। এবার শরীর ভরে পান কর। বৃষ্টি থামে, যেমন মানুষের মুখের হাসি একটানা চলে না, সেই রাগে বাজতে বাজতে বৃষ্টি থেমে যায়। আবার জন ও যান অভিনন্দনের ভঙ্গিতে করতালি বাজিয়ে পথে বেরিয়ে আসে—নাগরিক-কীর্তনে সাড়া পড়ে যায়। তবু মরা রাজ্যে ফের ধীরে ধীরে নৈরাশ্য ঘনিয়ে আসে, সে মুহুর্মুহু পাল্টায়, পূর্বাবস্থায় ফিরে আসে। আকাশের মেঘ তার মনে ও শরীরে ছায়া ঘনায়, দিনের রোদ তার শরীরে পড়ে আনচান করে, প্রকৃতির হাওয়া তার অন্ত্র থেকে উদগত হয়। জগৎ সমস্যা যেন তার চোখে বাষ্পাচ্ছন্ন আর ভিজে। এভাবেই কি সে কান্না টের পায়?— একথা সে ছাড়া আর কে বলবে। কালো রঙের মেঘ বা ছাতা দেখে সে কখনো কি ভয় পায়, গঙ্গার ধারে গেলে মনখারাপ আকস্মিক ছুটে এসে গ্রাস করে, মৃদু কষ্ট অনুভূত হয় তার ঘাড়ে, গ্রীবায়, গলার একটু নিচে ক্রিমির মতো সরু সরু অপুষ্ট শিরায়। দুই উরুর সন্ধি জোড়নে সে ঈষৎ আর্দ্রতা টের পায়। হাঁটতে হাঁটতে মাঝপথে থেমে যায়। এ ফুট থেকে ও ফুটে পারাপারের চেষ্টা করে—ভাত কিনে

দিব্যি খায়। এভাবেই এক টাকা ফুরিয়ে যায়। হৃদয় কাত হয়ে আবার প্রত্যাশা করে। ছিপছিপে হাওয়া বয়ে যায় মুখের ওপর দিয়ে, ভরা পেট তাই পৃথিবীর সবুজ উড়ে উড়ে এসে গায়ে লাগে। বীণা সিনেমার হলটির গায়ে রেখার পোস্টার —মারাত্মক মোহময়ী মনে হয়। পিঠ চুলকোয় তার, ওদিকে হাত পাঠিয়ে দিতেই স্বয়ংক্রিয় কাজ চলে। চোখ বুজে আসে আরামে। নিঃস্তেজ লাগে। অস্পষ্ট হয়ে আসে চতুর্দিক। মাথার ভেতর চকিতে ঢুকে পড়ে কোনো অজ্ঞাত বাদক যেন ক্রমাগত সংগীতে আসে। বুদ্ধিভ্রম ঘটে। ধীরে ধীরে স্থির হয়ে যায়। অচল শরীরটি পড়ে থাকে কোথায় তা তার অজানার ভেতর দিয়ে দুপুরকে ঘন করে তোলে। জীবিত জীবনের যাবতীয় বিজ্ঞান মিথ্যা হয়ে যায়। কিছুক্ষণ কাটে এভাবে—। শুধুমাত্র কিছুক্ষণ। তারপর মাংস অস্থি মজ্জা মুচড়ে মুচড়ে ফের প্রাণ ফিরে আসে দেহে—অনেকটা জোয়ারে উঠে আসা নদীর মতো। সে উঠে দাঁড়ায় মেডিকেল কলেজ চত্বরে। দ্যাখে মেঘ সরে গেছে অবাক করে দিয়ে। ঝুরো মাটির মতো ঝরঝর করে নামছে রোদের গুঁড়ো। কলেজ স্কোয়ার থেকে চারদিকটাতে লোক গমাগম বেড়েছে। ঠাণ্ডা শীতার্ত একটা হাওয়া টের পেল সে। দেখল, স্বগতোক্তির মতো তার ঠোঁট নড়চে, 'এক টাকা'। সকালের মেয়েটির কথা বিস্মরণে চলে যায়। আপাত জীবনের গোপনে অদৃশ্য নালি ঘার মতো যে প্রয়োজনের চাহিদাটি ছিল, সে যেন এইবার কথা কয়ে উঠল তার ভেতর। নীল আকাশ তার গহীনে প্রফুল্ল অনুভবের সৃষ্টি করেছে। ঝড়কে অতিক্রম করে জড় আবার কি তবে জীবন পেল নাকি! —মানবিক সান্নিধ্যের জন্য সে ভিড়ের ভেতর ঢুকল। এক ধরনের আচ্ছন্নতা তার ভেতর শুরু করল মৃদু আলাপন। সে বলতে লাগল এবং শুনতে লাগল, শুনতে লাগল এবং বলতে লাগল। কথা প্রিয় কথা, বহুবিধ কথা তা যেন একটি মাত্র উচ্চারণে নিনাদিত হতে হতে একটি পাখি বা ট্রামের মতো অভ্যাসের রূপ পেল। বাইরে দৃশ্যমান ভালোবাসাবাসি, তর্ক, হিংসা, বাণিজ্য, শিক্ষা, ভ্রষ্ট বিশ্বাস সবকিছুর ভেতর স্বপরিবাহি সেই উচ্চারণ। নিখিল আবেগে তা কোনো মানুষের ভেতর গলে। গলতে থাকে। কেউ কেউ-বা সেই উচ্চারণটিকে কানে নেয় না—ইণ্ডিয়ান সিল্ক হাউসে ঢুকে গিয়ে মিহি সুতোর কাজ দেখে। ঠোঁটে খালি হাসি আর পানের রঞ্জন। সে দূর থেকে দ্যাখে, সুদূর প্রত্যক্ষ করে। বৃষ্টি-ধোয়া অদ্ভুত এই নগরের কোথায় বিষাদ, একটি বুড়ি ঠাকুমা হেঁটে যায়, কলেজ স্ট্রিট মোড়ে গোলা বেসনে ডুবিয়ে চপ ভাজে কেউ। এইসব কিছু দেখতে দেখতে তার ঠোঁট নীরব হয়ে আসে। গ্রামদেশে সদ্য মাঠ থেকে তুলে আনা

টাটকা পটলের মতো নধর বাল্ব জলে ওঠে লাইটপোস্টের মাথায়। হাবিজাবি বই বিক্রি হয়। পুরুষমানুষ মেয়ে নিয়ে ঢোকে পাবলিক রেঁস্তোরার কেবিনে—ওদের মধ্যে যেন কি সম্পর্ক আছে। প্রেম! পা দুটি নীরব হয়ে আসে তার, সে থেমে যায়—হায় প্রেম! গুণে দ্যাখে এক টাকা। একাধিক একটাকা। প্রত্যাখ্যানগুলি গুণে দেখাটা বিলাস, সে পিছন ফিরে তাকায় না। এ ভাবেই একটা জীবনের ভেতর আরেক জীবনের বীজ ঘনিয়ে ওঠে। ছোটো ছোটো বীজে ভরে যায় রক্ত, বেঁচে থাকার মমতার কাছে সে মূক হয়ে যায়। নিজেকে ব্যবচ্ছেদ করে, রাতে খায়, ফের ঘুম আসে নিয়মে। হয়তো-বা, একথা সেই ভালো বলতে পারবে, ঘুমের মধ্যে সে কাকে স্বপ্নে দেখে—সাপ নাকি সন্ন্যাসি। নাকি দুজনকেই একসঙ্গে পাশা-পাশি শুয়ে ঘুমতে দেখে। উপলক্ষহীন সেই ঘুমের ভেতর চলতে থাকে চোরা স্রোত, স্রোত বাড়ে। চৈতন্য জুড়ে ভেসে যায় ত্যাগ ও প্রতারণা। সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে অপরিচ্ছন্ন ঠিকানায় সে বিষ্ঠা রেখে আসে। সুখকর যা কিছু তা পেটের ভেতর গিয়ে কিভাবে দুর্গন্ধময় হয়ে ওঠে তা সে বুঝে পায় না। ফেরার পথে রাস্তার ধারে বরং পায় রক্তভেজা লাল কাপড়, ব্যবহার করা। কখনো-কখনো দ্যাখে ট্রাম লাইনের তার ছিঁড়ে বিদ্যুৎ পড়ে আছে পথে—সেখানে অমনি লাল ন্যাকড়াছেঁড়া পতাকায় গাঁথা। গত রাতে দাঁতের গোড়ায় জমে থাকা মাংসের কোষ সে আঙ্গুলে করে টেনে দাঁতের ভেতর থেকে বার করে নিয়ে আসে। তারপর ছুঁড়ে ফেলে দেয় কলকাতায়। পেট থেকে উঠে আসে বিস্বাদ, বমির ভাব। আবার এক টাকার অন্বেষণে। আবার নানারকমের শব্দ, মানুষ, যানবাহন, খুশিতে হেসে ওঠা। বিদ্যাসাগর কলেজের কাছে একটি মেয়ে আর একটি ছেলে, যুবক-যুবতী দেখা। ছেলেটি মেয়েটির বাঁ হাত ধরে ফেলে—ক্রশ করে দুটি হাত। সে দ্যাখে গতকালের মেঘের রঙ এখন মানুষের চোখে না ঝরার অপেক্ষায়, বেশ ভারসাম্য আছে। শোনা গেল—মেয়েটি ছেলেটিকে বলল, 'এই জানো ওই পাগলটা না—।' মুখের কথা কেড়ে নিল ছেলেটি, 'আজকাল পাগল ছাগল নিয়ে বড়ো বেশি ভাবছো মনে হচ্ছে' ? 'না—দেখনা, কি মজার ঘটনা, ওকে একটাকা না দিলে ও নেবে না'—'বেশি দিলে' 'দিয়ে দ্যাখনা'—। ছেলেটি তাকে দু'টাকার একটা নোট বাড়িয়ে দেয়, সে ঘাড় নেড়ে বলে—'এক টাকা'। মেয়েটি হাসে, প্রেমিককে বলে, 'নব্বই পয়সা দিলেও নেবে না। বাবুর পুরোপুরি ষোল আনা চাই।' সে কোনো কথা বলে না, তার কোনো বিকার নেই। নিজের স্বভাবে দাঁড়িয়ে থাকে সে। প্রকৃত দার্শনিকের গলায় ছেলেটি বলে, জানো তো লোক কখনো এমনি এমনি

পাগল হয় না, কোনো একটা ফিলসফিক স্ট্যাণ্ডপয়েণ্টে স্টে করে থেকে ক্রমাগত ভাবতে ভাবতে সে পাগল হয়। পাগল হয়ে ওঠে।' আহ্লাদে টলটলে হয়ে ওঠে মেয়েটির গাল। ঠনঠনিয়া কালীবাড়ির দিকে চোখ পড়তেই কপালে আঙুল ছোঁয়ায় তারা, তারপর কর্ণওয়ালিশ স্ট্রিটের দিকে হাঁটতে থাকে, দেখে মনে হয় পায়ে ভর না দিয়ে তারা ভর দিয়েছে আবেগে। জড়াজড়ি করে, ঘেঁসে—গায়ে গা লাগিয়ে। সে তাকিয়ে থাকে সোজা. এখন তার প্রাণের বর্ণে, স্পর্শে, গন্ধে কি অতীত উঠে আসে বেনো জলের মতো। নাকি অদ্ভুত সময়হীনতার ভেতর দিয়ে উড়তে থাকে তার প্রবল চেতনা। অস্তিত্ব। আস্ত শরীরটা। কলকব্জায় কখনো খিল লাগে, কখনো ছেড়ে যায়। এক জামবাটি ভাতের মতো গদ গদ করে আবার তার উপুড় করা চোখে ঘুম এসে যায়। ঘুমের মধ্যে সে দেখতে পায় তার নিজেরই মুখ—থমথমে, ফোলা ফোলা। একটি চায়ের দোকানের বেঞ্চে বসে মাটির খুরিতে চা কিনে খাচ্ছে সে। শরীরের ভার ক্রমশ কাহিল। চা খাচ্ছে অপরিচিত সব আরো লোক। তারা বচসা করছে কত রকমের। টানটান ভাবের পরিবর্তে তাদের চেহারায় কেমন একটা ঢিসঢিসে ভাব। তাদের আরেকজনকে গল্পটা বলছে। কেন লোকটা একটা টাকাই চায়। কেন বেশি বা কম নেয় না—এর মূলে নাকি একটা গল্প আছে—। —'ছোটোবেলা থেকেই ও ছিলো একটু ডানপিটে। সব-কিছুকে থোড়াই কেয়ার করত। বিশ্বাস করত শুধু নিজেকেই। মা বাবার একমাত্র ছেলে, বড়ো আদরের ছিল সেই মতিগতি। কিন্তু কোথা থেকে এক ভূতরোগ পেয়ে বসল তাকে। রাস্তার মোড়ে মোড়ে শনি ঠাকুরের থানে যেসব পয়সা পড়ত, দক্ষিণা পড়ত তা ও তুলে নিয়ে দিব্যি খরচা করে ফেলত। একদিন ওদের চার বন্ধুতে বাজি হলো, তখন এক অমাবস্যার নিশা রাতে ও চলল শনির থান থেকে টাকা পয়সা যা পায় তুলে নিয়ে আসতে। ও গেল, গিয়ে দেখল পিতলের রেকাবিতে মাত্র একটি এক টাকার কয়েন আছে পড়ে। সে নির্ভয়ে তুলে নিল এবং তারপর হাঁটতে লাগল। কিন্তু সে যেন ক্রমশই নিজের পথটা হারিয়ে ফেলল, চিনতে পারল না আত্মীয় পরিজন, চেনা অচেনাকে। এভাবেই সে পাগল—তার মুখ থেকে শুধু একটি টাকার খবর পাওয়া যায় তাই'—সুপ সুপ চা টানার শব্দের ভেতর থেকে এমনি সব ছেঁড়া-ছেঁড়া কাহিনীর টুকরো ভেসে আসছিল, জবাবে কোনো কথা বলার জন্য তারও ঠোঁট বুঝি ক্ষীপ্রতায় সরসর করে উঠেও প্রসঙ্গ গুলিয়ে ফেলল। ঘুম ভেঙে গেলে সারাটা চৈতন্য জুড়ে এখন কেমন যেন এলোমেলো ভাব। —খিদির-পুরের এদিকটায় সে গঙ্গার হিম হাওয়া টের পেল, জাহাজ ঢুকছে জাহাজঘাটায়।

সে কোনো ভ্রুক্ষেপ না করে উঠে পড়ল। দেখতে লাগল খেলার মাঠ, একাকী ঘোড়া, বুদ্ধের মতো গাছ—এই সবই যেন খুব ধীরে, ঘন হয়ে তার ভেতর শেকড় ছড়িয়ে দিচ্ছিল। ক্রমশ তাকে বেঁধে ফেলছে মাটির সঙ্গে। মারাত্মক কোনো একটা ঝড় না এলে আলগা করবে কে? তবে হ্যাঁ, সে টের পায় আশ্চর্য এক লীলা—যখনই খুব একা হয়, মগ্ন হয় তখনই যেন মনে হয় শরীরের সব রক্ত আস্তে আস্তে জায়গা বদল করছে। ফুসফুসের রক্ত হৃৎপিণ্ডে চলে যাচ্ছে, হৃৎপিণ্ডের রক্ত যকৃতে গিয়ে স্থির হয়ে আছে। তার মাঝে শুধু এক দুপদুপ আওয়াজ। সে যাকে হাতের কাছে পাচ্ছিল তাকেই গিয়ে শোনাচ্ছিল, যেন-বা বোঝাতে চাইছিল এই পৃথিবীর একটি মানুষের পক্ষে এক টাকাই যথেষ্ট। তার বেশি চাওয়ার থাকতে পারে না। সুতরাং পাওয়ার কথা তো ওঠেই না। অধিকাংশ জায়গা থেকে সে ব্যর্থ হয়ে, প্রতিহত হয়ে ফিরে আসছে ঠিকই, তবু জানে সে অপ্রতিহত, দুর্নিবার। এইভাবে এই পৃথিবী, অন্ধকার, আলো, ঘাস, জীবমণ্ডল, সৌর-সম্ভবনা তার রক্তে সঞ্চারিত হচ্ছে ধীরে। আঁধারে ক্রমশ ঘন হয়ে আসছে সন্ধ্যা। পুরানো হলেও এই শহরটাকে নতুন মনে হচ্ছে। গৃহস্থ ঘর থেকে এখনো শাঁখের আওয়াজ, এখনো বিড়াল সরে যায় একদিক থেকে আরেকদিকে। এখনো মানুষ মানুষকে পাহারা দেয়। গভীর রাতে ফুটপাথের কিনারে শুয়ে শুয়ে সে অনুভব করল কে একজন এসে শুয়ে পড়ল তার পাশে। একটা ভিখারিনী। এখান থেকে চাঁদ দেখা যায় সরাসরি,—একটি বাঁকা আলতাপাটি শিমের মতো রক্তাক্ত। ভিখারিনীর মুখে দেওয়ালে চাপা চাঞ্চল্য। সে চুপচাপ ক্ষয়ে যেতে লাগল। কোনো বোঝাপোড়া থাকে না। মা ফলেষু,—তারপর অন্ধকার ফিকে হতে হতে কোলাহল জাগল। সে চোখ খুলে দেখল এই ভুবনদরিয়া ভেসে যাচ্ছে এক অদ্ভুত অপার্থিব আলোয়, অসংখ্য অণু পরমাণুতে। জীবাণুতে। কেমন এক অহঙ্কারবোধ এসে তাকে নড়িয়ে দেয়। সে ভাবে এবার থেকে একটু করে যুক্তিবাদী হবে। ঠোঁটের কোণে জেগে ওঠা এক একটি ধাক্কা থেকে হাসির কণার জন্ম হয়। সাধারণত সকালের দিকেই সে হাসে। তারপর পেশি কেমন শিথিল হতে হতে নিস্তেজ হয়ে পড়ে। এমন সময় কোথা থেকে 'ঠঙ' করে এক শব্দে এক টাকার একটা কয়েন এসে পড়ে তার পায়ের কাছে। সে তবু যেন দুবার ঠঙ ঠঙ শব্দ শুনল, যেন-বা বহুকালের ওপার থেকে চুড়ির ঠনঠন শব্দ একটু অভিমানে বা রাগে ঠঙঠঙ করে বাজছে! এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখল সে, কাউকে পেল না। পেল শুধু অপ্রতিরোধ্য রোদের যাতায়াত। সে যেন শুনল ফিসফিস করে আশ্চর্য মানুষ তার সম্পর্কে আলোচনা করছে—লোকটা খুব

ভালো ছিল, লোকটা খুব সরল ছিল, লোকটা বড়ো প্রেমিক ছিল। সে অনেক অনেকদিন আগেকার কথা—লোকটা ভালোবেসে বিয়ে করেছিল একটি খুব সাধারণ কচি বয়সী মেয়েকে। তার চোখ ছিল তেঁতুল পাতার মতো সরু, নাক ছিল করবী পাতার চেয়েও ধারাল। সে ঘরদোর ধোয়া মোছা করত, রান্নার হাতটি ছিল বড়ো স্বাদু—তাই খেয়ে খেয়ে লোকটার রোগা চেহারায় মাশ লাগছিল বেশ। চারিদিকে গাছে গাছে তখন এমন অভাব ছিল না, বরং নিয়মিত ফুল ফুটত, পাখিও ডাকতে পারত খুব মন খুলে। লোকটা দেখল আকাশের দিকে তাকিয়ে সূর্যকে আড়ালে ফেলে কেমন দাবকা দাবকা মেঘ উড়ে যাচ্ছে। বউটির জন্য তার ভয় হতো। লোকটা বড়ো ভাবুক ছিল—দিবাজাগরণের টানা দিনে তার কেবলি লাটাইটা ঘুড়ির সুতো ছেড়ে যেত মাথার ভেতর। তবু কেন জানি মনে হতো ঘুড়িটা বুঝি ঠিকঠাক উড়ছে না। একদিন সংসার থেকে গলা বাড়িয়ে কচি বউটি নিজের পেটে হাত দিয়ে দেখাল—বাচ্চা হবে। প্রতিদিনই নানা রকমের জীবন ঘনীভূত হয়ে উঠতে লাগল তাদের জীবনে। ন'মাস পূর্ণ হয়ে গেল। তারপর গর্ভযন্ত্রণা শুরু হলো মেয়েটির, তাকে হাসপাতালে দিতে হলো। সেখানে গিয়ে যন্ত্রণা বাড়ল বই কমল না। ডাক্তার প্রেসক্রিপশন লিখে হাতে ধরিয়ে দিল লোকটার। যে ওষুধ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের দেওয়ার কথা সেই ওষুধ বাইরে থেকে কিনে আনতে হবে। নিঃস্ব, একা, প্রায় ভিখারি লোকটা শোকের স্তব্ধতার ভেতর দিয়ে টাকার সন্ধানে দৌড়াদৌড়ি করতে লাগল। জোগাড়ও হলো। দোকানে কিনতে গিয়ে লোকটা শুনল একটাকা কম পড়েছে! তখন তার বউয়ের শ্বাসকষ্ট উঠছে ওদিকে। দুম করে একটা টাকা কেউ তাকে দিল না, দৌড়াদৌড়ি করে যখন সে অর্জন করল তখন পেটে বাচ্চা নিয়ে বউটি তার মরে গেছে। তখন থেকেই লোকটা জানে, 'অর্জন করার যদি কিছু তার বাকি থেকে থাকে তা হল একটি টাকা। তাই বুঝি পৃথিবীর কাছে তার ঘন ঘন এই হাত পাতা।'—সে এসব শুনছে আর হাসছে। অচেনা একটা লোককে নিয়ে লোকেরা কত ধরনেরই গল্প ফাঁদে। শোনায় হয়তো সবই প্রকৃত জীবনের মতো, তবু যেন জীবন থেকে গল্প একটা অনতিক্রম্য দূরত্বেই থেকে যায়। একটি মানুষের প্রকৃত ইতিহাসটা তাই সে ছাড়া অন্য কারো পক্ষে জানা সম্ভব নয়। অতএব সে শোনে কিংবা শোনে না, প্রতিবাদ করে কিংবা করে না। প্রায়ান্ধকার একটা রাস্তার ওপর দিয়ে পি জি হসপিটাল থেকে যাদবপুর থানা পর্যন্ত চলে যায়। রোজদিনকার একটাই গল্পের কুঁড়ি ফোটে তাকে নিয়ে, যা সত্য, সে টের পায়—হাঁটে, খায়, হাত পাতে এবং ঘুমোয়। মাঝে মাঝে বহুবিধ চিন্তা-

তরঙ্গের ঢেউ ওঠে তার মজ্জায়—আরোহণ, অবরোহণ চলে। উত্থান পতন চলে। ঘুমের ঘোরে শ্লেষ্মায় জড়িয়ে যায় তার গলা। সে গলা ঝেড়ে একটু কেশে নেয়। কখনো-বা জেগে জেগেও কাশে। যেমন এখন, এই সন্ধ্যায়, ঢাকুরিয়া লেকে এসে সে এই প্রথম কাশল। একটি গাছের তলায় সন্ধ্যার আঁধারে জড়াজড়ি করে বসেছিল একটি লোক, মাঝবয়স্ক, আর একটি বউ—বোধহয় হায়-গেরস্থ হবে। শরতের মাঠে ধানগাছের মতো এরা ছেয়ে যাচ্ছে এখন কলকাতায়। সে গলা ঝেড়ে কেশে উঠতেই ওদের জোড় পরস্পর ছেড়ে গেল জাগতিক সত্যটিকে প্রমাণ করার আশায়। বউটি বলল, 'সেই পাগলটা—ওকে একটা টাকা দিয়ে দাও, চুপচাপ চলে যাবে।' পাগলটার চোখ থেকে স্ফটিক আলো যেন ঠিকরে বেরিয়ে গিয়ে পড়ছে মাঝবয়সী লোকটার কাঁচা-পাকা গোঁফে—আর চিকচিক করছে ক্রূরতায়। লোকটি মেয়েটিকে বলল, 'পাগল নয় খুব শেয়ানা—পয়সাটা ভালোই চেনে। ওর মা সেও তো পাগলি। বুড়ি এখনো বেঁচে আছে। পাগলি অবস্থাতেই এখানে ওখানে ঘুরে বেড়িয়ে তার পেট হয়ে যায়'—মেয়েটি ন্যাকা গলায় গেয়ে উঠল, 'যাঃ, তোমার গলায় যেন কোনো কথাই আটকায় না, একটু সভ্য করে বলতে পার না'—লোকটি বলল, 'শোনোই না—তো সেই পাগলি বুড়ির সঙ্গে মাঝে মাঝেই এখানে ওখানে ওর দেখা হয়ে যায়। পাগলির আবার ওর মতো আরো সব ল্যাণ্ডাপ্যাণ্ডা আছে। এক এক জনের কাছে পাগলি একটি করে টাকা চায়। সেই টাকাটি জোগাড়ের জন্যই ও ওরকম একটি টাকার নাটক করে—শ্লা ঢ্যামনা—এক নম্বরের শয়তান।' মেয়েটি বলল, 'গালগপ্পোটি তো শোনালে, এবার একটা টাকা দিয়ে দাও, নইলে বিদায় হবে না। ঠায় দাঁড়িয়েই থাকবে। আমি আবার আজ বেশিক্ষণ থাকতে পারব না, লকাইয়ের বাবা আজ তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরবে বলেছে'। বাধ্য হয়ে লোকটি ছেঁড়া মতো ময়লা একটি এক টাকার নোট চামড়ার মানিব্যাগ থেকে বার করে বাড়িয়ে দিতে দিতে বলে, 'যাঃ শ্লা—তোর ভাগ্য ভালো আজ। এত লোক গাড়ি চাপা পড়ে তোর শ্লা মৃত্যু নাই'—মনের ভেতর প্রস্তুতি থাকা সত্ত্বেও সে কোনো কথা বলে না, টিভির সামনে বসে থাকা বোকা দর্শকের মতো দেখে যায়। জীবকুলের মহা-প্রাণীটির যে দু-কান খোলা আছে তা দিয়ে নানা শব্দাবলী ঢোকে এবং বেরোয়। তাদের মধ্যেই বেছে বেছে সে কিছু-কিছুকে নিজের মধ্যে টেনে নেয়। আসে কোমল হাওয়া—কটু গন্ধ। কখনো সে বিচ্যুত হয়, কখনো ফের উঠে আসে। কখনো হাসে, কখনো অশান্ত হয়ে থাকে বুকের ভেতর। তবু সে স্থির হয়ে হেঁটে বেড়ায়—তাকে ঘিরে গল্প জন্মায় কলকাতায়। কলকারখানার ধোঁয়ায় যখন

আটকে যায় শহর, যখন জনপদের গায়ে দেখা যায় যৌবনের শ্যাওলা, বৃষ্টির জলে গলে যায় বুদ্ধের সবুজ তখনও সে একই রকম। অনাদি, অনন্ত। নির্বিকল্প।— ঠিক কোথা থেকে এসেছে বলা যাবে না, বলা যাবে না যাবে কোথায়। শুধু তার তথাগত বোধ দাঁতে দাঁত বসিয়ে এক ধরনের লড়াই করে যায়। বিপ্লবীরা এটাকেই বুঝি ব্যাখ্যা করবেন প্রতিবাদ বলে।

মহাজাগতিক

বৃষ্টির পর বালি মাটিতে কেঁচো ফোটে, খুব লাল মুখ তাদের। কচি কচি হাঁসের বাচ্চারা চুক চুক করে খায়। উইপোকার পিঠে পাখা এলে তারা মাটি ফুঁড়ে এক আজব পতঙ্গের মতো ওড়াওড়ি করে। তখন পৃথিবী থেকে নেমে আসে পাখি এবং খায়। ঠিক তখনই কচু পাতার রঙে এক আলাদা ধরনের সবুজ খেলা করে. দোঁয়াশ মাটির রঙে বহুকালের ময়লা লেগে পচা মাটির একটা আদল জেগে ওঠে। আর এই মাটিকেই খুব আয়েস করে খেতে জানে মেটে কেঁচো। তারা একটু লম্বা হয়, স্বাস্থ্যবান হয়, আর ভয় পেলে নিজের গর্তের ভেতর দিয়ে নালি কাঁকড়ার মতো কয়েক শ ফুট মাটির তলায় একেবারে আদিম পৃথিবীতে চলে যেতে পারে।

নকারামের বউয়ের নাম পদ্ম। গভীর রাতে তার যখন ফুটে ওঠার সময় তখন নকারামকে ঘেন্না লাগে তার। লোকটার গায়ে কেঁচোর গন্ধ। জীবনের সঙ্গে জীবিকা মিলেমিশে এক হয়ে গেছে। নকারাম কিছুতেই স্বীকার করে না তার গায়ে কেঁচোর গন্ধ। কারণ তার খুব বিশ্বাস সে মানুষ।

এই নকারাম দিনের আলোয় একটা কোদাল আর একটা সেলোফেন প্যাকেট নিয়ে কেঁচো ধরতে যায়। পৃথিবীতে এত কেঁচো আছে বলেই বোধহয় নকারামের জন্ম, নইলে লোকটা কোনো কাজেই লাগত না সংসারের। সে সুখী মানুষ. তার কোনো দুঃখ নেই, পৃথিবীতে যতদিন কেঁচো আছে ততদিন তার ভাতের চিন্তা নেই। ভাত খেয়ে, হজম করে, মহাআকাশের নিচে সবুজ মাঠের ওপর হাগতে গিয়ে নকারাম মাঝে মধ্যে টের পায় ওই ভাত আবার পেটে গিয়ে কেঁচো হয়ে গেছে। তখন ডাক্তারের কাছে সে গিয়ে বলে. ওষুধ দাও—কিরমি নেমেচে হাগার সঙ্গে।

এত কেঁচো কি হয় গো—

মাছে খায়—

কি মাছ ?

সোনার মাছ, রূপার মাছ, কত তাদের নাম, খোলসা মাছের মতন গড়ন, গায়ে ঢ্যামনা সাপের ছিয়া ছিয়া দাগ—তারা জল কেঁচো খায়। চালান যায় শহরে, কেজি দরে বিক্রি হয়। রঙের জল থাকে কাঁচের জারে, তার মধ্যে মাছ। মাছ আবার মানুষ খায়—

আপ ট্রেনে উঠে পড়ল নকারাম। সাউথ ইস্টার্ন রেলওয়ে মানেই জলা, পদ্মের চাষ, পানিফল আর দুদিকে হা হা করে ছুটে যায় ফাঁকা মাঠ। এখন বর্ষার শেষ, আকাশে তাই নীল চাঞ্চল্য, চাঞ্চল্য মানে সারা পৃথিবীতে রোদ চনমন করে। দুহাত তুলে ডাকে।

সেলোফেন প্যাকেটে আছে তিন রকমের কেঁচো—জল কেঁচো, মেটে কেঁচো, আর বালি কেঁচো। পাঁশকুড়া থেকে সাঁতরাগাছি আসতে সময় লাগে দেড ঘণ্টা মতো। এই দীর্ঘ সময়ের বাতাসে নকারামের চুল থেকে স্নানের জলটুকু শুকিয়ে গেছে কখন।

ট্রাম ধরে বাস ধরে সে যখন বালিগঞ্জ ফাঁড়ির কাছে এসে পৌঁছল তখন ঘাম নেমেছে কপাল থেকে, যেন শিব পাঠিয়েছে গঙ্গাকে—কিন্তু ধারায় কোনো মহিমা নেই। শরীরের নুন মাথা ফুটে বেরিয়ে লোকটাকে আরো অনেক কালো ছিপছিপে করে দিল। দুর্দান্ত পৃথিবীতে মরে থাকা কয়েকটা ন্যাডা গাছের মতো দাড়ি তার মুখে, আর হাতে কেঁচো। শহর যাত্রার সম্বল এই, আর গোটা পাঁচেক টাকা।

লিফটের এলিভেটরে ঢুকে পাঁচ নম্বর বোতাম টিপতেই প্রায় হুস করে নকারাম চলে এলো গুপ্ত-বাড়ির দরজায়। দরজাটি পেতলের, বহুকালের পোষা বিড়াল পায়ের কাছে সুপ্ত হয়ে আছে। সজাগ কুকুর ডাকল, ঘেউ। অর্থাৎ কে এবং কি চাই ?

দরজাটা খোলাই ছিল। এ-বাড়ির বড়ো ছেলে অভীকবাবুর পুত্র মোটাসোটা একটা ছাড়ানো শাঁক আলুর মতো। লাল রক্তে ভরা চেরি ফল দাঁতে কেটে সে কুকুরটাকে বলল, ডোণ্ট বার্ক, স্টপ ইট মাই বয়, হি ইজ কেঁচোকাকু—

কেঁচোকাকু তখন বিনয়ের হাসিতে গলে গড়িয়ে গেল অ্যাকুরিয়ামের দিকে। নীল জল দেখে তার আরেকবার বউয়ের নীল চোখের কথা মনে পড়ে গেল। জলের ভেতর লাইট জ্বলছে, সবুজ খুঁটছে মাছ। মাছ মানে ব্ল্যাক-ফিস। হোয়াইট অ্যাঞ্জেল,

ফাইটার, জেব্রা ক্রসিং, ব্ল্যাক অ্যাঞ্জেল আর গোল্ড ফিস। মাছটার রঙ অভীক-বাবুর হাতঘড়ির মতো। পিছনের কাঁটা ছুটছে জলের ভেতর দিয়ে সময়কে অতিক্রম করে। নকারাম বুঝতে পারে না দিনেব আলোয় এখানে লাইট জ্বলে কেন?

অভীকবাবুর স্ত্রী দেবলা একটু হাসলেন। এবং বললেন, মাছরা কেঁচো খাচ্ছে তো নকারাম?

নকারামের মাথার চুলগুলি এবার ফ্যানের উড়ন্ত হাওয়ায় দাড়ির মতোই উদ্ভট, গাছ হয়ে উড়ছিল। আর অ্যাকুয়ারিয়ামের ভেতর মাছগুলি খাচ্ছিল কেঁচোর পিঠ, পেট, বুক এবং সর্বস্ব।

অভীকবাবু লোকসভার নির্বাচনে নির্বাচিত হয়েছিলেন। পেশায় আইনজীবী। বিদেশে থেকে লেখাপড়া শিখেছেন। এখনো নানা জনসভায় ভাষণ দিতে গেলে এক ভাষার পিঠে আর এক ভাষা চড়ে বিভ্রাট শুরু করে দেয়। ইদানিং খুব মেপে মেপে শুদ্ধ বাংলায় ভাষণ দিতে চেষ্টা করেন তিনি। ক্লায়েণ্টদের নিয়ে কাজ কারবারে বড্ড ঢিলে পড়ছে। যখন অধিবেশন চলে তখন দিল্লিতে, আর অন্য-সময় এই কলকাতায়, জন্মভূমিতে। তবু সারাদিনের কাজ আর ক্লান্তির ফাঁকে অ্যাকুয়ারিয়ামের মাছগুলিকে তিনি দেখতে আসেন। কখনো খুব আদর করে নিজের হাতে কেঁচো তুলে দেন তাদের মুখের কাছে। জল আর মাছ,—আর ভেতরে সবুজ গাছ। কেমন ভালো লাগে অভীকবাবুর। তারপর কোনো দামী সাবানের ফেনায় বিপ্লব এনে হাত দুটিকে ধুয়ে নেন, যেন কোনো নোংরা লেগে না থাকে।

কখনো মাঝরাতে ঘুম ঠিক মতো না হলে কলকাতা শহরকে প্রেতিনীর মতো মনে হয়। ড্রিংক করলে চোখ লাল হয়, কিন্তু হৃদয় মজে না আর আজকাল। বইয়ের থাকে, পাতায় ল এ্যাণ্ড অর্ডার সংক্রান্ত লেখাগুলিকে রুপোলী পোকায় কাটে। তখন অভীকবাবু চলে আসেন তার দ্বিতীয় অ্যাকুয়ারিয়ামটির কাছে। জলের রঙ হালকা নীল, তার মধ্যে এক কেজির মতো একটা মাছ। অনেকটা কাতলা মাছের মতো দেখতে। সময় সুযোগ হলে এই মাছ মানুষ খায়।

ইতিহাসের ভেতর দিয়ে এক অদৃশ্য ধারায় ভাসতে ভাসতে এই মাছটি এসে ঠাঁই পেয়েছে এই বাড়িটির তিনতলায়। দক্ষিণ আমেরিকার আমাজন নদীতে জন্মেছিল কবে, জলদস্যুর মতো ঝাঁকে ঝাঁকে এগিয়ে এসে জ্যান্তমানুষকেও খুঁটে খেয়ে ফেলতে পারে। লাস্ট ইয়ারে আফ্রিকায় যে তীব্র খরা হয়ে গেল, সরকারী প্রতিনিধি হয়ে পর্যবেক্ষণে গিয়েছিলেন অভীকবাবু। অনেক কসরত করে একটা বড়োসড়ো কাঁচের জারে ভরে এনেছিলেন তিনি। গভীর রাতে পাখির মাংস বা মেটে কেঁচোর মোটা

মুখগুলিকে কেটে কেটে টুকরো করে অ্যাকুয়ারিয়ামের মুখে ফেলে দেন তিনি। অনেকটা নীরোর বেহালার মতো জল বাজে সেই চৌকোমতো কাঁচের জলাধারটিতে। ছোটাছুটি করে মাছ। খুঁটে খুঁটে মাংস খায়। তখন অভীকবাবু খুব উল্লাসে বলেন —পিরআন হা-পিরআন হা—

রক্ত কখনো বা শিথিল হয়ে যায়। বয়স বাড়ছে। জীবনের যাবতীয় মজা কেমন যেন অবশ হয়ে শরীরের ভেতরেই শুকিয়ে যাচ্ছে। অনেক কিছু পাওয়া হলো না অভীকবাবুর। স্ত্রীকে মারাত্মক রকমের সেকেলে বলে মনে হয়। নিজের নামের পাশে এতোগুলো সম্মানের ধাক্কা না থাকলে প্রকাশ্যেই অনেক কিছু করে ফেলতেন তিনি। টাকা, নারী, যশ কোনোটাই যে ঠিকমত হলো না জীবনে। কখনো কখনো পার্লামেণ্টে স্পিচ দিয়ে নেমে এলে তিনি বুঝতে পারেন বিদেশে থেকে কিছু কিছু শিখতে গিয়ে দেশজ অনেক কিছু থেকে বঞ্চিত হয়েছেন।

তারপর রাত্রে ঘুম এসে গেলে পৃথিবী আর সমুদ্র এক হয়ে ভেসে যায়। কলকাতায় কোনো টানাপোড়েন থাকে না। পাঁশকুড়ার গ্রামে নকারামের পৃথিবীতে তখন ঈশ্বরের মহিমা নামে আকাশ থেকে। ভূগর্ভে তলিয়ে থাকা কেঁচোরা প্রাণ পায়, সরসর করে মাটি ঠেলে এগিয়ে এসে আকাশের দিকে তাকায়। ঠোঁট খুলে শিশির খায়। কেউ কেউ লম্বা শরীর টেনে নির্জন পৃথিবীতে ঘাসের উপর পায়চারি করে। তখন অসীম আনন্দে ভরে ওঠে বুক। হাসতে গেলে ঠোঁট ফেটে তাদের মাটি বেরিয়ে আসে, গর্তের মুখে জমা হয়।

এমনি কিছু অপরূপ ভোরে নকারামের ঘুম ভেঙে যায়। মাঠের ওপর তখন হা-হা করে ছুটে আসে দুরন্ত হাওয়া। কোথা থেকে আসে টের পায় না নকারাম। নরম মাটির ছের উঠছে পৃথিবী থেকে। নকারাম খুব সংযত হয়ে পা ফেলে মাটিতে। শিকারে নেমেছে সে, পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীই নিজের প্রাণটিকে নিরাপদে রাখার জন্য আপ্রাণ হয়, অধিকাংশই বড়ো বেশি চালাক। যেন হাওয়া এসে বলে দেয়, সামাল—

কাল রাতে নকারাম ভাত খেয়েছিল শালুক ডাঁটার তরকারি দিয়ে। মাছ ছিল না বাটিতে। বোম্বাই আলুর ঝোল। মুখে রোচেনি বউয়ের, একটু অম্বল থাকলে—সারা গা কেমন যেন ম্যাজম্যাজ করে এই সময়।

পেট ফুলছে, শরীর ফুলছে, মন ফুলছে তার। আরেকটি নকারাম আসছে পৃথিবীতে।—এই খবর কি মাটির ভেতর থেকে ওই তুচ্ছ প্রাণীগুলি জেনে গেল নাকি। গর্তের মুখে কেউ নেই, শুধু নরম মাটি লাগিয়ে ভিজিয়ে গেছে। আর এই

ভোরেও চাঁদের আলোয় ভিজছে নকারাম। একটি নকারামের আসায় আরেকটি নকারাম হাঁটছে পৃথিবীর ওপর পা ফেলে ফেলে। যেটুকু জ্যোৎস্না এখনো মরেনি, মজেনি তারই দাক্ষিণ্যে প্রাণ পোড়ে এখন। কিন্তু কেঁচো কোথায়, যে মানুষটা আসছে সে খাবে কি—

খুব কালো, ঝুকঝুকে জোঁকের মতো মুখ তুলে একটি কেঁচো নকারামের দিকে তাকিয়েছিল। ধরতে গেল নকারাম নখ দিয়ে টিপে। কিন্তু সেই টিপ ফসকে লোকটাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে প্রায়-উজবুক বানিয়ে ছাড়ল কেঁচোটা। সব জীবের সেরা নাকি মানুষ! হক কথার এক কথা!

কোদাল দিয়ে ছোবল মারল নকারাম, কিন্তু সেই ছোবল খেল বেচারা, ঝামরা মাটি। আর কেঁচো নিজের চেনা বহুকালের পালিয়ে যাওয়ার পরিচিত পথ দিয়ে চলে গেল পৃথিবীর গভীরে। যেখানে হিম আর দীর্ঘকালের জমে থাকা উত্তাপ এক হয়ে আছে। মাটির পর মাটি কাটল নকারাম, তুচ্ছ প্রাণীটি ততক্ষণে নিরাপদে পৌঁছে গিয়ে হয়তো ঘুমিয়ে গেছে নিজের খেয়ালে।

আর বোকার মতো কিছু প্রাণী যারা রয়ে যায়, মেতে থাকে মশগুলে, তারা ধরা পড়ে নকারামের হাতে। এক টিপে মুখটি ঠিক মতো ধরতে পারলে পৃথিবীর হৃদয় থেকে টেনে তুলে আনে নকারাম। বলে, চলো—কলকাতা যাবে—

একদিন ট্রেনে যেতে যেতে বাগনান স্টেশনে একজনের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল নকারামের। তার নাম ডিগবাজি। আসলে চেহারাটা লোকটার একটু কুঁজো, অনেকটা উল্টো মানুষের মতো। অর্থাৎ পাছা ভারী, মাথা ছোটো। লোকটা আসলি একটা সেলোফেন প্যাকেটে ভরে কিছু ফড়িং নিয়ে যাচ্ছে কলকাতায়। নকারাম বলল, এত ফড়িং কি হবে—

ডিগবাজির ঠোঁটের ভাঁজে একখণ্ড হাসি যেন কাঠবেড়ালির মতো ডিগবাজি দিয়ে বেড়িয়ে এলো। বলল, বাগবাজারের দত্তবাড়ির পাখি খাবে—

কি পাখি—

টিয়া, মুনিয়া, কাকাতুয়া, ময়না, আরো কত—

কত টাকা বেতন তোমার—

মাসে ৩০০ টাকা। খাই খরচ। যাতায়াত ভাড়া। ওদের একটা খুব ভালো ভীমরাজ আছে। তার জন্য আবার গঙ্গাফড়িং চাই! বোল জানা পাখি, টপ্পা গায়—

টপ্পা কি জিনিস নকারাম জানে না। গায় মানে গান গায়—এই ভেবে বলল,

বাহ, বেশ পাখি তো। আমি ভাই কেঁচো নিয়ে যাই সাউথে। বালিগঞ্জের বাবুর বাড়িতে দু'দুটো অ্যাকুয়ারিয়াম। মাছ মানেই কেঁচো খাবে, তাদের খাদ্য। বোঝোই তো। তবে কেঁচো আর ফড়িং—তোমারটা ভাই ঢের ভালো। ধরেও সুখ—। রাতে বউয়ের কাছে শুতে গেলে বউ বলে গায়ে কেঁচোর গন্ধ। জীবনটা শেষ হয়ে গেল।

সিগনাল নেই, ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে লাইনে। প্যাকেটের ভেতর কেঁচো এবং ফড়িংয়েরা নিজেদের মধ্যে মারামারি করে। যুদ্ধ করে। নকারামের কথা শুনে ডিগবাজি একটু বিজ্ঞের হাসি হাসল। কবিতা বলল, নদীর ওপার কহে ছাড়িয়া নিশ্বাস / এপারেতে সর্বসুখ আমার বিশ্বাস। —আমার বউ রাত্রেবেলা আবার অন্যরকম। বলে, এই ফড়িং চেহারা, ফড়িং ধরে ধরে তোমার এই হাল। ঝগড়া আর অশান্তি কত সই বলো। আমরা এখন আলাদা থাকি। বাচ্চাটাও হয়েছে ফড়িংয়ের মতন রোগা, শুধু ওষুধ খায়।

হাওড়া স্টেশনে এসে এই দুটি লোক যে যার হারিয়ে গেল। বিনা টিকিটের যাত্রী বুদ্ধি করে হারিয়ে যেতে হয় এই সময়।

আজো অভীকবাবুর সঙ্গে দেখা হল না নকারামের। দেবলা দেবীকে ডেকে নকারাম বলল, বাবু তো নেই, এ মাসের মাইনেটা—

ক'দিন এসেছিস এ মাসে—?

কেন, রোজই তো এসেছি।

গত মাসের কেঁচো কিন্তু ভালো ছিল না নকারাম—

কেঁচো তার আবার ভালোমন্দ কি মা, ভগবানের জন্মিত—

কথাটি শুনে বেশ কিছুক্ষণ হাসলেন দেবলা। এখনো যেন শরীর অটুট। কিন্তু বালির বাঁধ। যে কোনো সময় টলে যেতে পারে। আজ তিনদিন অভীকবাবু বাড়ি ফেরেননি। এরকম মাঝে মধ্যে হয়। কোথায় থাকেন কে জানে! উনি বললেন, কেমন করে তুমি কেঁচো ধরো নকারাম?

কেন বলুন তো মা—

তোমাদের দাদাবাবুর মাথায় যে কেঁচো ঢুকেছে সেটাকে বের করে আনো দেখি—

কোনো কথাই বুঝল না অশিক্ষিত তুচ্ছলোক নকারাম। জিজ্ঞেস করল, বাবুর মাথায় কেঁচো—

কথা বাড়ালেন না দেবলা। চলে যেতে যেতে বললেন, কাল সন্ধ্যায় বাবু বাড়ি ফিরবেন। তখন আয়।

একটা কাজের লোক এসে নকারামকে ডেকে নিয়ে গেল রাস্তায়। তারপর বলল, বাবু বলেছেন দু' প্যাকেট কেঁচো নিয়ে আজ বিকেলে আমার সঙ্গে যেতে। সেখানে দেখা হবে। চুপি চুপি।

সকাল দশটার রোদ এখন কলকাতায়। ভড়কে গেল নকারাম। এ আবার কি রকম কথা! কেঁচো দিয়েচি পয়সা পাই—তা আবার অন্য কোথাও। যাই হোক বাড়ি ফিরে সারাটা দুপুর মাটি খুঁড়ে বেড়ালো সে। কিছু কেঁচো পেল, কিছু পেল না। কারণ তাদের এখন মধ্যাহ্ন, যারা বাবু তারা বিশ্রাম নিচ্ছে পৃথিবীর তলায়। যা পেল তাই ভরে নিল নকারাম। বউকে বলল, আজ ফিরতে আমার রাত হতে পারে—

কেন—

বাবু ডেকেছেন, বেতন হবে—

আজ সকালে শচী বামুন মরেচে। রাতে ভয় লাগবে আমার—। যন্ত্রণা হচ্ছে সকাল থেকেই—

বালিশের তলায় আঁশবটি নিয়ে শুতে যাস। আমি এসে যাবো'খন—

লোকটির সঙ্গে কোথায় যেন যাচ্ছিল নকারাম। আজ অনেকদিন পরে খোলা-মেলা হাওয়ায় এই শহরের উপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে সে। চেনে না কোনো কিছুই। যে শহর ভাত দেয় তাকে চেনা খুব একটা সহজ নয় মানুষের পক্ষে। লোকটার নাম কালু শেখ। লোকটা বলল, কোথায় চলেছি বলতো—

কোথায়?

বাবুর আরেক বাড়িতে। এখানে বাবুর পোষা মেয়েছেলে থাকে—

আগেও অনেকের মুখেই অনেকবার শুনেছে নকারাম। তাই তেমন অবাক হল না সে। শুধু বলল, সেখানে কেঁচো কি হবে—

সেখানেও আছে একই রকমের দুটো অ্যাকুয়ারিয়াম। তা যাক তুই কখনো গেছিস—

কোথায়—

মাগি বাড়ি—

চুপ থাকল নকারাম, কোনো উত্তর না দিয়ে হাঁটতে লাগল। কত মানুষের কত কাজ। নকারামের বউয়ের কথা মনে হচ্ছিল। গর্ভযন্ত্রণা যদি জেগে যায়। ভূতের ভয়ে যদি, বয়স আর কতই বা হবে তার! এক মনে একটা ট্রাম লাইন ধরে হাঁটছিল, এমন সময় কালু বলল, আমি অনেকবার গেছি। আছে ১০টা টাকা—?

খিদে পাচ্ছিল নকারামের। দুপুরের ভাত পেটের ভেতর কখন গিয়ে মরে আছে। পেট খালি—একেবারে ধোয়া, পরিষ্কার। আর আকাশে অল্প মেঘ উঠেছে।

কালু শেখ বলল, জানিস তো বাবুর একটা দামী ব্যবসা আছে। দেশ বিদেশে মেয়ে চালান পাঠান। যাকে ইচ্ছে হয় আগে খান, তারপর পাঠিয়ে দেন।

আরো কি কি বলে যাচ্ছিল কালু। নেশায় লোকটির চোখ সবসময় লাল হয়ে থাকে। এই প্রথম নকারাম শুনল অভীকবাবুর মেয়ে-চালানের কারবার।

গলির ভেতরে গলি ধরে কালু শেখের সঙ্গে নকারাম এসে পৌঁছল। অনেকদিন পরে অভীকবাবু নকারামকে বললেন আয়, আয়, ভেতরে আয়। বাইরে শুরু হলো বৃষ্টি। একটি আইবুড়ো মেয়ে দাঁড়িয়েছিল অভীকবাবুর কাছে। খুব সুন্দর দেখতে। তার শরীরে ঘাম, অর্থাৎ সেও ভিজছিল। যেন ভিজছিল।

তারপরই আকাশ তুমুল হয়ে গেল। অ্যাকুয়ারিয়ামের মাছগুলিকে নিজের হাতে কেঁচো দিচ্ছিলেন অভীকবাবু। তার দীর্ঘ বলিষ্ঠ চেহারা এখন অন্যরকম। মেটে কেঁচোর মুখ কেটে কেটে টুকরোগুলো দিল নকারাম, পির-আনহাকে এগিয়ে দিলেন অভীকবাবু। বললেন, এই মাছ মানুষ খায়। আজ তো আর বাড়ি ফিরতে পারছি না, এখানেই থেকে যা। সকালে বাড়ি যাস। আর এবার থেকে এখানে কেঁচোর জোগান দিবি তুই। যে লোকটা দিত সে দুদিন হলো মারা গেছে। মাছ-গুলি উপোসি আছে—

ঘুমিয়ে পড়েছিল নকারাম একটা মাদুরে। পাশেই শুয়েছিল কালু শেখ। মাঝরাতে পিঠে ঠেলা দিয়ে তুলল নকারামকে। বলল, এই, বাবু সেই মেয়েটাকে খাচ্ছে। ওই শোন, শব্দ—

নকারাম শব্দের ভেতর দিয়ে তাকাল একেবারে জানলার বাইরে। বৃষ্টি থেমে এখন জীবন্ত জ্যোৎস্না ছড়িয়েছে আকাশ। এই সময় কেঁচোদের তলিয়ে থাকা পৃথিবী থেকে উঠে আসার কথা। শিশির খাওয়ার কথা। আবার ঘুমিয়ে গেল সে। কারণ ঘুম ছাড়া এত শক্তিশালী পৃথিবীতে আর কি আছে।

বেতনের ৪০০ টাকা হাতে নিয়ে ট্রেনে উঠে এল নকারাম। দেখল সকালের লোকাল ট্রেন ফাঁকা, কারণ আজ রোববার। শুধু এককোণে বসে বসে বিড়ি টান-ছিল ডিগবাজি। চোখাচোখি হতেই হেসে উঠল লোকটা। বলল, কাল রাতে দত্তবাবুদের বাসায় ছিলাম। বাবু গেছেন বিহার, তিন লরী চিংড়ি মাছ চালান গেল।

নকারাম বলল, চিংড়ি মাছ?

আরে তাই তো। বাগদা আর গলদা—ওদের ব্যবসা এখন রমরমে। দু'চারটে খেতে পাই মাঝে মধ্যে। জলদেব্‌তা সেই নীল দাঁড়ার ভেতর যে ক্ষীর ভরে রেখেছে।

পথের দেখা পথেই হারিয়ে গেল। নকারাম ঘরে ফিরে দেখল তার বউয়ের ফুটফুটে একটি বাচ্চা হয়েছে। খুব ভোরে দেখা জ্যোৎস্নাটির কথা মনে পড়ে গেল তার। এখন এই কচি নরম নিষ্পাপ শরীরে লেগে বুঝি জ্বালা ধরিয়েছে পৃথিবী। যেখান থেকে চালান পেয়ে এখানে এসেছে, দুটি জায়গা আলাদা। আকাশ, মাটি, জল—দিগবিদিক সবকিছুই আলাদা। হাওয়াটিও আলাদা। খুব ভালো করে হাত মুখ ধুয়ে নকারাম যেন অন্য কোন সংশয় থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিল প্রথমে। তারপর মহাজীবনের আনন্দটি শরীরে ধারণ করে ছেলেকে কোলে নিল সে। ছেলে আর কেউ নয়? ছোটখাটো সদ্যজাত আরেকটি নকারাম।

প্রস্থানপর্বে নাটক জমে উঠল

আলো জলল না। বাঁশগাছের তলা থেকে মাদুর গুটিয়ে নিয়ে রাধা এসেছে দখিন দুয়ারে। ঘরের ভেতর ঝুঝকা আঁধার। '—জ্বালনা গো ডিবিরি বাতি।' কেউ কোনো রা কাড়ল না।

পেট থেকে তেতো ঢেকুর এলো গলায়। আকাশে মৃদু চাঁদ উঠেছে। তেমন তেজ নেই। আনন্দবাগের পনেরো বছরের মেয়ে রাধা ভাতের সঙ্গে নিমবেগুন খেয়ে ভেতরটা তার তেতো করে ফেলেছে। নিম কাচা ছিল, বেগুনে পোকা—'ওমা এই মেয়ে রাঁধতে জানে না।'

'—সর্বনাশী তোর কপালখানা ছাখ—'

'—ক্যানে, কি হল মা—'কত্তা জিগায়, 'মেয়েব বুড়ো আঙুলটা কই?' আমি বলি—'মানীজন ভুল না বুঝ-অ। অপঘাতে লয়, গেল সনের আগেব সনে দুগ্গল ডাঙার মাঠে ঘন বর্ষায়, কাঁকড়ায় কাটল আমার মেয়ের আঙুল।' 'বচন শুনঅ—হ্যাঃ! ইকথা বিশ্বাস করতে হবে?'

মায়ের মুখ থেকে এই গল্প কম করে সাতবার শুনেছে রাধা। বিয়াভাঙার গল্প। এভাবেই বিয়েটা তার ভেঙে গেল। গেল তো গেল, সে দুঃখু মনে ধরে রাখবি ক্যানে! আগুনে হাওয়া দিলে অগ্নি বাড়ে, দুখে দিলে মন—ছুটে যোজন যোজন—

ঝিট চালের নিচে মাটির দুয়ার, মাটি-পিঁপড়ে একবার ঢুকলে ছের তুলে তুলে ঘরের আটকাণ্ড করে। নইলে একা একা নিমবেগুন খেয়ে রাধা শুয়ে-বসে আকাশ দেখলে শরীরটি তার বাড়ে, সোমত্ত হয়। মেয়েমানুষের দেহ, রস জাগলেই রক্ত জাগে—নিমবেগুন খেলে ভেতরটি তার শুদ্ধ হয়। মা রেবতী ঘরে ঢুকল, 'জ্বালনা গঅ ডিবরি বাতি—'

পাঁচ মানুষ দূরে, কাঁকুরে মোরাম রাস্তায় রিক্সা যায় গড়িয়ে গড়িয়ে নেড়া-দেউল। ছায়াবাণী সিনেমা হলে আজকের ছবি—রামভক্ত হনুমান। মাইক চেঁচায়, সেই বিরক্তিতে সন্ধে ঠিকমতো জমতে পায় না।

'শাঁখ বাজা না গঅ—। আকাশ ছেয়ে তারা ফুটল যে—'

'তেল নাই ডিবরিতে। গা ম্যাজম্যাজায়—'

ফাঁকা উঠানের ওপর চোতফাগুনের বেহায়া হাওয়া জগঝম্প লাগায়। ধুলো ঘুরে ঘুরে ওঠে। মরা জ্যোৎস্নায় তবু দেখা যায়। নাকে ঢোকে, চোখে পড়ে, দাঁতের পাটিতে পড়ে ধ্বংস হয়। তবু বইবে। ছিনাল বাতাসের রঙ্গ দ্যাখো—

রেবতী বলল, '-ই বাতাসডা যেন গায়ে লিসনি আবার—'

'ক্যানে—আরাম লাগে।' অন্ধকারে বোঝা যায় না বিদ্রূপে রেবতীর ঠোঁট ওল্টায় কিনা। তবে গলার স্বরে ভেঙানোর একটা রেশ। গিরিমাটি রঙের শাড়িকে শূন্যে তুলে ধুলো ঝাড়ে রেবতী। ঝুলে পড়া অন্ধকারের চেয়েও শরীরে ঢের অন্ধকার। তাই কেউ দেখল না চিমশানো গতরটি। চালের বাতায় মৌমাছি শুধু ভন্‌ভন্‌ শব্দ করে চাকে গুঁতো মারে বুঝি—নাকি মাছি ভনভন করে পৃথিবীতে। আকাশের এদিকটাতে ভগবান থাকে কেশপুর থানার সীমানায়। গগন পানে হাত তুলে রেবতী বলে—'তবে আর নিমবেগুন খেলি ক্যানে! —মায়ের খেলা হইচে য্যা বামুন পাড়ায়। শরীরটি তোর সুখে থাক মা—!'

ঘরের লোক আনন্দবাগ, খালধার পেরিয়ে কুলিপাড় ধরে ঘরের দিকে আসছিল। কমাস আগে জেল থেকে পালিয়ে এসে দাড়ি কামিয়েছিল ধীরা লাপিতের কাছে। এখন সেই দাড়ি খড়ের নাড়ার মতো আবার জেগে বিপুল হয়েছে। আনন্দবাগের জীবনটাই কেমন, হায়, দুঃখু হয়! কেশ ঝুলছে মাথার ওপর। ···ধানকাটার কেস। ···দখলদারীর দাঙ্গা। ডান হাতের বাহুতে টাঙির দাগ, লোকটা বিষ হজম করতে পারে বটে।

রেবতী দোলই পাড়া থেকে কেরোসিন তেল নিয়ে এলো। জ্বললো ডিবরি। তবু আঁধার, আহা, একবিন্দু আলোয় আর আঁধার ঘোচে না।

রাতে শাক খেতে মানা তবু শুষনি শাক থেকে ঘাস বাছে রাধা। অল্প আলোয় মৃত্যুর যেটুকু নেশা তাতেই মত্ত হয়ে ছুটে এসেছে একটি কাঁচপোকা। রাধা জানে না এই প্রাণীটি তার চোখের মতোই, অবিকল। একটি পোষা হাঁস আছে ঝুড়িতে ঢাকা, সকালে ডিম পড়বে তার পেট থেকে, ঝুড়ির ভেতর ঢাকা। এখন সেই হাঁস

বন্দী জীবন থেকে বাইরে আসার জন্য ঝুড়ির ফুটোর ভেতর দিয়ে সাঁড়াশি ঠোঁট বের করে অন্ধকারে উদাস হয়ে তাকিয়ে থাকে।

এমন সময় উঠোনে কে পড়ল ঝুপ্ করে। রেবতী চেঁচিয়ে উঠল, 'কে ?'

অতর্কিতে নয়, স্বাভাবিক পায়েই ঢুকেছিল লোকটা। বলল,—'কে আবার, চোখের মাথা খেয়েছে নাকি ?'

'—অ, তা এ-কদিন কুথায় ছিলে ?'

'—গেছলাম সুপা পুড়সুড়ির জাতে। ঝাণ্ডি খেললাম দু'শ টাকা—'

'—এনেছ কিছু।'

'—মদ খেয়ে শুয়েছিলাম হাটতলিতে, পকেট মারি হয়ে গেল।'

'—ছ্যা! মরতে তবে এলে ক্যানে ?'

'—মরব মরব নিজের ঘরেই মরব',—একটা হালকা হাসি হাসল আনন্দবাগ।

সাপ ধরতে জানে আনন্দবাগ। ট্যাংরা মাছ ধরতে জানে। মানুষের খুব ভেতরে হাতটি পাঠিয়ে ইঁদুর ধরার মতো মনের খবরটি ধরে আনতে পারে খুব সহজে।

চাল ফুটছে মাটির হাঁড়িতে ; সবে ফুট ধরেছে ; আম গাছ থেকে পেঁচা ডেকে উঠল। আধসের মাত্র চাল ছিল, তাই হাঁড়িতে তুলে জাল দিচ্ছিল রাধা। '—কি হবে এইটুকু ভাতে!'

আগুনের শিষ উঠে এখন চতুর্দিক আলোকিত। সেই আলোয় এখন রাধার মুখ—একবার বসন্ত হয়েছিল, মুখে তারই দাগ, গর্ত কাটা ; তবু যৌবনের যে মহিমা এই বয়সে মেয়েদের থাকে তার কোনোরকম খামতি নেই।

'—টাঙিটা কই', আনন্দবাগ বউয়ের দিকে তাকায়।

'—ওইত চালের দেতায়', রেবতী বলে।

নিমকাঠের দেতার ওপর থেকে টাঙিটা নামিয়ে হলুদবাটা সীলে সান দিতে থাকে আনন্দবাগ। পাথর পেয়ে হেতারটা ঝকঝকিয়ে ওঠে, আগুন ছোটে। ধার যত বাড়ে, হাঁড়িতে ভাত ফোটে তত—

আনন্দবাগের জীবনটাই অন্যরকম। বেঁচে থাকার খেয়ালে লোকটা যা ইচ্ছে তাই করে। খুন করতেও হাত কাঁপেনি তার। পাপ পুণ্য নাই, শুধু যা ভালো লাগে। শরীরে যতদিন সাহস আছে ভালোলাগাটি ভোগ করে যাই। মানুষ জীবন, এতো ছার। এর থেকে মিথ্যে আর কি আছে!

রেবতী বলল, 'কাল রাতে আবার পুলিশ এসেছিল।'

'—কি বললি ?'

'—বললাম তিন সন্ধ্যার আগেই লোকটা ঘর ছেড়ে খাল পার বাগে চলে গেল। পুলিশ বলল,—মিথ্যা কথা, মাগীর কাপড় তুলে চাবকাতে হয় তবে যদি সত্যি কথা বলে—

শুনে আনন্দবাগ শব্দ করে হাসে—হা-হা-হা। তখন খোলা বুকে কাঁচাপাকা রোম তুলতুল করে, অন্ধকারে অলৌকিক অচিনে খাবি খায়। পাপী আনন্দবাগের চৌদিক আলো করে থাকে তার বেঁচে থাকার আনন্দটি। পুলিশকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে এই মহাপৃথিবীতে তার পাপকর্ম—দিনের আলোয় সে পূর্বের মতো হাওয়ায় উড়ে যায়। আর রাত্রে চতুর্দিকে তার অন্ধকার, মেয়ে-বৌ তারাও যেন আঁধারে ধোয়া। শুধু নিকষ আঁধারের মাঝে চাঁদ-তারা কুকৃঝিক খেলে। হিংস্র সেই অন্ধকার ঠেলে রঘুবাগের একমাত্র বংশজ এই আনন্দবাগ মাঠে-ঘাটে ঘুরে বেড়ায়। গাছের তলায় শোয়, ঘুমিয়ে পড়ে। খালের জলে মাছের নড়পড় শব্দ শোনে। ধানের বনে ধান কেঁউটের শিস শোনে। মরা রক্তহীন আকাশে তখন রাত-পাখি আর মাঠের আড়কোলে ইঁদুর ছুঁচো কাঠবিড়ালি হাঁটে। আনন্দ আগাম টের পায় —কবে রাত তালাশির লেগে পুলিশের গাড়ি আসবে। কোনো অমাবস্যায় কালি-তলি কালি ঠাকুর জাগে। জেবন পায়।

রেবতী আর রাধা—মায়ে-ঝিয়ে হেঁসেলের কাজ করে। ভাতের মাড় গেলে আলু চটকাতে বসে রাধা। উনুনে কাঠকুটোর বড়োই অভাব—খালি নিভে যায়, ধোঁয়া হয়। বাঁশের চোঙয়া ফুঁক মারে রেবতী। ফুঁ দিতে দিতে জিভ শুকিয়ে যায়।

একই ঘরে তিনটি প্রাণী শোয়। এভাবেই রাধা জন্মাল। দিনে দিনে শরীরের চাহিদাটা কেমন যেন ফিকে হয়ে গেছে, রেবতীকে কাছে টেনে যখন সে ছটফট করে, রাধা তখনও বুঝি অসাড় হয়ে ঘুমায়। ডিবরি বাতির টিমে আলোয় কোনো কোনোদিন রাধার শরীর দেখা যায়। আর আনন্দবাগ ঘর থেকে বেরিয়ে যায় জ্যোৎস্নায়, অন্ধকারে।

ভাত খেতে খেতে আনন্দবাগ বলে, 'আজ পুলিশ আসবে—'

'—কেমন করে জানলে—'

'—আমি জানি, সব জানতি পারি। জিপ গাড়িতে থাকবে চারটা লোক। হাতে তাদের তিন সেলি বেটারীর টর্চ। আমি ভাবচি এবার একবার ধরা দিয়ে দুব—'

'—ক্যানে—'

'—বহুদিন জেলখানাটাকে না দেখলে আমার ভাল্লাগেনি। সবকিছুকেই কেমন যেন একরকম লাগে। হেজে যাচ্ছে জীবনটা। কয়েদখানার ভাতে কেমন একটা গন্ধের মিশেল থাকে। খেতে খেতে কত কথা মনে পড়ে যে। পুলিশ, সে আমার কি করবে। রাধাটাকে গচ্ছিত করে দিতে পারলেই আমি গিয়ে কয়েদ-খানায় থাকব। একটা তেঁতুল গাছের ডালে রাতে বসে কোকিল ডাকে।—ঘরের দুয়ার আমার আর ভাল্লাগেনি। রেবতী শুন—'

রেবতী বলল, 'তা ভাল্লাগবে কেনে, সংসার করার সময় মনে ছিলনি! নি-মুরাদে লোক। উপায় নাই—মাগের গতর ভেঙে খাও আর গাছের ডালে কোকিল দেখে বেড়াও। তোমার কি লাজলজ্জা নাই নাকি গো। তুমি গে কয়েদখানায় পড়ে থাকলে আমরা যাব কুথা—'

এ-কথার আনন্দ বাগ কোনো জবাব দেয় না। ভাতের চালে কাঁকর ঢের, বেছে শেষ করা যায় না। বাছতে বাছতে ডিবরি বাতির আগুনের দিকে তাকায় আনন্দ। জীবনের কোনো কিছুতেই এখন সে আর উত্তাপ খুঁজে পায় না, যেন স্পৃহাহীন এক মৃতজীবন কাঁধে বয়ে বেড়াচ্ছে। বয়ে বেড়াচ্ছে রাজনীতি আর দখলের সেই বিপ্লবহীন সময়কে। নিজের এ-সব কথা এখন আর কার সঙ্গে! এই মেয়ে বউ—আনন্দ বাগের পিঠ, কাঁধ, শিরদাঁড়া এখন অন্যরকম ব্যাথায় টাটায়। ঠাণ্ডা মেরে যায়। পাপ কাজ করতে আর ইচ্ছে জাগে না। করেও না। কিন্তু পুরানো কাজের জের—একটা ঢাকতে আরেকটা হাঁ মুখ বের করে আসে—

আনন্দ বাগ বলে,—'যাক না কদিন, ভালো না লাগলে গরাদের শিক বাঁকিয়ে, পাঁচিল টপকে পালিয়ে আসব—'

'—হ্যাঁ—সে ক্ষ্যামতা তোমার আর আছে নাকি!'

আনন্দ বাগ তার দুই হাতের দিকে তাকিয়ে থাকে। পাঁচ আঙুলে ছাওয়া, ল্যাঠা মাছের মতো ভোঁতা ভোঁতা স্বাস্থ্যবান আঙুল। বাহুর পেশিতে কিছু ঝুল এসেছে, কনুই যেন একটুখানি নুয়ে এসেছে মাটির দিকে। এরই নাম কি বয়স। মনের অগোচরে, আলগোছে সে যেন মাঠের দিক থেকে আসা কেউটে সাপের শিস শুনতে পায়। সেই শিসে তখন আর কোনো ভয় খুঁজে পাওয়া যায় না। এখন আর সাপের দিন নাই পৃথিবীতে। আইনের দিন।

'—রাধা, ঘুমলি নাকি লো—' রেবতী ডাকল মেয়েকে।

রাধা বলল, 'মাঝদুয়ারের ঠাণ্ডা আছে। গায়ের জলন কমবে।'

রেবতী কঠিন স্বরে বললে, 'না। ঠাণ্ডা লাগাসনি। ঘরে গে কাঁথের এক ধারে শুবি যা—'

একধারে রাধা। মধ্যিখানে বাপ। আর রেবতী একেবারে অন্য ধারে। এ দিকটা কাঁথা বা মাদুর কিছুই নাই। শুধুই মাটি—সেই ভুঁইয়ে শরীর ঢেলে শোওয়া। মানে জীবনযাপন।

তারপর রাত হু হু করে বয়ে যায় পৃথিবীর ওপর দিয়ে। নিশা নামে। ঘুম আসে। হিম পড়ে আকাশ থেকে। শরীরের গরম বেরিয়ে এসে বিছানার কাঁথা বালিশে লেগে যায়। সে গরমটি এখন আর আনন্দ বাগের শরীরে নাই। তাই ঘুম আসে না চোখে। শুধু চোখ জড়িয়ে জড়িয়ে যায়—আবার খুলে যায়। খোল-জোড়নের এই খেলা চলতে থাকে রাতে আর মানুষে। রাধা খুব ঘুমিয়ে যায়। হাত-পা ছোঁড়ে। রেবতী ঘুমোয়। শুধু আনন্দ বাগ—সে যে জেগে থাকে একেবারে তা কিন্তু নয়। আবার ঘুম যে আসে না সে-কথাও জানে আনন্দ বাগ। শরীর ম্যাজ-ম্যাজ করে। কোনোদিকে কোনো আনন্দ নাই। নিত্যনূতন চেতন নাই জগতের। সবকিছুর মধ্যে বহু পুরনো কালের একটা লীলা। বহু দেখা জীবনের খেয়াল আর যেন জাগাতে পারে না কোনোকিছু। জীবন্ত একটা তাপের অভাবে সে প্রতি রাতেই একটু একটু করে বুড়ো হতে থাকে। ঘেরাটোপের ভেতর দিয়ে অলৌকিক আকালের হিম যেন ছুটে এসে তার হাড়ে পাঁজরে ঢুকতে থাকে। সে পরিষ্কার টের পায়। দেখতে পায় একটা কালীঠাকুর।

কিন্তু চোখ খুলে চেয়ে দেখতে গেলেই কোথায় ঠাকুর!

সেই এক নিবিড় অন্ধকার।

মাঝরাতে দুটো হুড লাইটের ফোকাস এসে লাগে ঘরের চালে। আলোর সেই ঝলক বিছানায় শুয়ে শুয়েই টের পায় সে। জিপ গাড়ির শব্দ থর থর করতে করতে সামনাসামনি এসে থেমে যায়। আনন্দ বুঝতে পারে এটা পুলিশের গাড়ি, তাকে ধরতে এসেছে গভীর রাতে। আজ আর পালিয়ে দৌড়ে উঠতে ইচ্ছে করে না তার। আরো শান্ত, স্থির, অনড় মানুষের মতো সে যেন ঘুমিয়ে আছে। গাড়ির শব্দে ধরপড়ি উঠে পড়ে রেবতী। বললে, 'পুলিশ—'

আনন্দ বাগ যেন ঘুমিয়ে, কোনো কথাও তার কানে ঢোকে না। জবাবহীন মৃত মানুষের মতো ঘুমিয়ে থাকে সে।

রেবতী এসে ঠ্যালা মারে, 'ওগো শুনছ। ঘরের দরজায় পুলিশ—'

রাধা বলে ওঠে, 'বাবা পুলিশ—'

আনন্দ বাগ বলে, 'কই !'—

'—ওই তো দরজায় ধাক্কা—'

রেবতী দরজা খুলে দেয়। কাঁধে বন্দুক। লোক দুটোর হাতে টর্চ। একজন, বলে, 'আনন্দ বাগকে বেরিয়ে আসতে বল।'

'—সে নাই', রেবতি বলল।

'—কোথায় গেছে—'

'—খালপারের দিকে চলি গেল সন্ধ্যায়। বলে দুদিন ফিরবনি—'

'—ঘর দেখব। সার্চ করব ঘর। সরে যা—'

এই বলে লোকটা রেবতীকে ঠেলে ঘরে ঢুকে যাচ্ছিল। রেবতী বলে, 'দ্যাখোনা ভাতের হাঁড়িটিও খুঁজে দ্যাখো।'

'—উইখানে কে শুয়ে আছে ?'

'—কে আবার, মেয়ে-জামাই—'

টর্চ মারল লোকটা। আঁধার কেটে সেই আলোর ঝলক যেন আগুনের মতো জ্বলে উঠল ঘরের ভেতর। মাটির দেওয়াল। কাঠের খুঁটিতে ঝুলছে একটা ছেঁড়া কাঁথা। এই সমস্ত ঘরে যা যা থাকে—হাঁড়িকুড়ি কিংবা অন্যান্য সব আলোকময়। তারই মাঝে একটা যুবতী মেয়েমানুষকে জড়িয়ে শুয়ে আছে তার মরদ।

এতকালের উত্তাপহীন জীবনের একঘেয়েমির ভেতর আজ কোথা থেকে যেন হঠাৎ উত্তাপ খুঁজে পায় আনন্দ বাগ। কয়েদখানায় যেতে আর মন করে না তার। ঘুমে কাদা হয়ে পড়ে থাকে তাই।

'কি হল ? কি দেকচেন আপনারা অমন করে ? ঘরে মেয়েমানুষ শুয়ে আছে,' রেবতী বলে।

'—মাগীটার চেহারা ভালো—খাবে ভালো··· ।'

আরো কয়েকটি কথা বলতে বলতে পুলিশের লোক গিয়ে উঠল তাদের গাড়িতে। এ গাঁ সে-গাঁ ঘুরে ফিরে কয়েদীদের সন্ধান করা গাড়ি তারপর গিয়ে থামবে কেশপুর থানায়। যারা ধরা পড়বে তারা চালান যাবে সদর শহরে। মেদিনীপুরে।

'—এবার ছাড়। রাধাকে ছেড়ে দাও দিকি। মেয়েটার গায়ে যে মায়ের খেলা ফুটেছে—'

'—গরম গাটা জ্বরে পুড়ে যায় যে।' আনন্দ বাগ বলে।

'—কি হলো ধরা দিবে বলে মেয়েবৌয়ের আঁচলের তলায় রয়ে গেলে যে—' রেবতী বলে।

মাথার সিথানে ধারাল টাঙিটা ঝক্‌ঝক্‌ করছিল। হাতে তুলে নেয় আনন্দ বাগ। কান পেতে শোনে সে—ধানের মাঠে কেউটেরা ডাকছে। সেই শীস থেকে একটা গরম হলকা যেন তার গায়ে এসে লাগে। বাঁচার খেয়াল জাগল বুঝি মনে। প্রাণে তার বিষের খেলা। কিন্তু কথার কোনো উত্তর দিল না। কাঠের বাঁটটি তার হাতে, কাঁধে ঝক্‌ঝক্‌ করছে ধারাল তেহার। সে এখন চলেছে খালের পারে।

অন্ধকার রাত আছে বটে এই পৃথিবীতে। সে রাতটা কাটতে কাটতে আনন্দ বাগ আবার পাপকাজে বেরিয়ে পড়ে। সাধু হওয়ার সাধ রইল পড়ে। আবার লোকটা মানুষ হয়ে পেটের কথা ভাবতে থাকে।

আর হাঁটতে হাঁটতে চলে যায় এক অদ্ভুত অলৌকিক নীল অন্ধকারের ভেতর দিয়ে।

অনাবাসী

মানুষের বিরক্তি থেকে, মর্মজ্বালা থেকে তাকে চেনা যায়। তাকে চেনা যায় তার পরাহত জীবনের রূপে ও রেখায়। কতবার কতভাবে সে বদলে গেছে সেই পরিসংখ্যায়। তখন হয়ত এই সর্বাঙ্গে একটা অস্পষ্ট ছায়া,—অনায়াসে নিভে যেতে পারে। অবিচল সেই ঔদাসীন্য তখন খুব একটা অসম্ভব কিছু নয়।—কোথা থেকে একটা টান যেন আলগা হয়ে আসছে। তবু এ-জগৎ প্রাণময়, প্রাণের ধর্মই মানুষকে আবার কাজের ভেতর চালিত করে (কেন শুধু শুধু বিভ্রান্ত হচ্ছো ?) তখন মনে, হয়, জগতে কোথাও কোনো অসঙ্গতি নেই। যা কিছু বেদনা, অসঙ্গতি সব শরীরের ভাঁজে লুপ্ত হয়ে যায়।

অভাবিত আকস্মিকতায় ঘুম ভেঙে যায় ত্রিলোচন দীক্ষিতের। কোমল অথচ গভীর, ভারি কিন্তু মধুর একটি শব্দ গলার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে। তা কোনো অর্থ পরিগ্রহ করে না, শুধু সকালে ঘুম ভাঙার পর নিত্য উদ্‌গিরণ। কোমরে লুঙ্গির ফাঁস সে দৃঢ় করে বাঁধে।

তখন চতুর্দিকে সকাল।

সকাল যেমন হয়—আবছা নীল রঙের। যেন আগে কখনো কোনোদিন চোখে পড়েনি। অদ্ভুত ভক্তি আসে মনে। আর আকাঙ্ক্ষা জাগে। গাছে গাছে ভালোবাসা ফোটে দিব্যি থোকা থোকা হয়ে। খুব একটা আশ্চর্য লাগে না তাই মানুষ সহজেই তার নামকরণ করে···ফুল।

তখন বড়ো রাস্তায় বাবুল ঘোষের চায়ের দোকানে অ্যালুমিনিয়মের ডেকচিতে দুধ ফোটে। লোকে সেই দৃশ্য দেখে বিশ্বাসই করতে চাইবে না যে জলে গোলা পাউডার দুধ ফুটছে, ভাববে খুব ভোরে দোয়া কোনো শ্যামলা গাইয়ের দুধ বুঝিবা।

পে পে শব্দে গাড়ি চলাচল শুরু হয়ে গেছে কখন। কোনো হোটেলের উদ্দেশ্যে ছাল ছাড়ানো ব্রয়লার মুরগি যাচ্ছে হ্যাচারিজ থেকে। অচিন বাড়ির জানলা গলে ভেসে আসছে ট্রানজিসটরের আওয়াজ—আহেরি ললিত রাগে সেতার বাজাচ্ছেন মণিলাল নাগ।

গলা খুলে একটু কেশে নিল ত্রিলোচন। কার্নিশে একটা কাক এলো এইমাত্র। ত্রিলোচন চিৎকার করে ওঠে, লুঙ্গির ট্যাঁকে যে দু'টাকার ময়লা নোটটা গোঁজা ছিল। কই গেল?

আক্রোশে, ঘৃণায়, বিতৃষ্ণায় ঘরণী মুখ ঝামটে ওঠে, যাবে আবার কোথায়। বিছানায় টিছানায় দেখ আগে ভালো করে। তারপর চেঁচাবে।

বাংলাদেশের পানকৌড়ির মতো কালো চোখ কচি মেয়েটার। লাবণ সেই বড়ো বড়ো চোখ মেলে মা বাবার চরিত্র দেখে। সে দৃষ্টি বড়ো বিনীত।

কোথায় যাবে, লুঙ্গি খুলে টাকা হাতড়াতে থাকে। বিছানায় সত্যি সত্যি টাকা ফিরে পেয়ে ত্রিলোচন খ্যা খ্যা করে হাসে। তখন জানলার ভেতর দিয়ে বাহির দেখা যায়—নোংরা আঁচড়াচ্ছে একটা পাতিকাক। একটু আগে যে এসে কার্নিশে দাঁড়িয়েছিল। এখন সেখানে একটা জলেভেজা ঘাস নেতিয়ে আছে, বোধহয় কাকটার পায়ে জড়িয়ে উড়ে এসেছে। মাথার দিকে ঘুমের সময়ও থাকে খাঁচাটি। টিয়াপাখিটির রঙ ওই ঘাসের মতোই। স্থতরাং সেও উড়ে যেতে পারে এই চিন্তা। পাখিটা তার অস্থিসার ঠ্যাং ঘসটাতে ঘসটাতে ডাকে। এক অস্থিরতায় তার ঠোঁট স্রিপ স্রিপ করে কাঁপে। যেহেতু লাল রঙ, মনে হয় রক্ত যেন টাল খেতে খেতে থেমে যায়।

এইভাবে ত্রিলোচন দীক্ষিত তার দিনযাপনের নিয়মে প্রবেশ করে। সকালের যাবতীয় দৃশ্যাবলী নস্যাৎ হয়ে যায় পাখিটির দিকে তাকিয়ে। যেন পাখি নয়, এ সেই ধাবমান কাল। তার বোধ ফিরে আসে। সবুজ রঙের একটা দিগন্ত বিরাট অন্ধকার। আত্মীয়তা, উপার্জন পেরিয়ে সে এসে দাঁড়ায় একটা বীভৎস অচিন গুহার মুখে। ওহে, এরই নাম জীবন। ত্রিলোচন আস্তে আস্তে তারই ভেতর প্রবেশ করতে থাকে।

স্ত্রী কন্যা আর তিন পুত্র।···

লম্বা লম্বা আঙুলগুলি দিয়ে এনামেলের বাসন থেকে মুড়ি তুলে তুলে মুখে ছুঁড়ল ত্রিলোচন। কিছুক্ষণ। বুড়ো লাউবিচির মতো স্যাঁতলা ধরা দাঁতের আগা দিয়ে কামড় দিল কাঁচা লঙ্কায়। তারপর সটান একঘটি জল গলায়। কলকল করে সে স্রোত নেমে গেল গভীরে। চোখে পড়ল চিড়ধরা ঘষা কাচের চশমাটি।

বাইফোকাল। দৃশ্যমান ঝাপসা কাচের ভেতর দিয়ে সে আশ্চর্যভাবে স্পষ্ট দেখতে পায়। তার ঘোলাটে চোখ জণ্ডিস রোগীর মতো যেন শূন্যতায় বিঁধে থাকে।

—স্ত্রী, কন্যা আর তিন পুত্র। তিন পুত্র তিন পদের। বড়টি বাপের পকেট কাটে, সাট্টা খেলে। তার নাম কালু। যেদিন সাট্টায় কিছু মেলে সেদিন গলা পর্যন্ত গিলে এসে মা-বাপকে খিস্তি করে। অথবা খালপাড়ে, গাছতলায় পড়ে থাকে। কিছুদিন আগে আবার অস্থান-কুস্থানের এক ছুঁড়িকে এনে ঘরে তুলেছে। পেটে ভাত যোগানোর মুরোদ নেই, এই গর্ভ দিল বলে। মেজোটির নাম ঢপা। সে কথা কইতে পারে না। হ্যালাখ্যাপা, ভ্যাল-ভ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। এই-ভাবেই তার গোঁফ গজাল। ছোটবেলায় দুষ্ট লোকে ডেকে নিয়ে গিয়ে ভুলিয়ে ভালিয়ে কি খাইয়ে দিয়েছিল। সেই থেকে ঠাকুর-ঠুকুর ডাক্তার-বদ্যি সব বিফলে গেল। কখন কি করে তার হিসাব জানে না। হাসে বোকার মতো। একই হাসি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে হাসে। আর পেট চিরে ভাত খায়। ছোটটি শ্যামল এবার মাধ্যমিক দেবে। এবং অঙ্কে ফেল মারবে। তার আবার সিনেমা দেখার শখ। হিন্দি পিকচার। তার তেমনি কাটের প্যাণ্ট চাই—প্যাণ্টলন। বচ্চনের মতো চুল রাখে, কাটতে যাবে সেলুনে। দাও—দুটি টাকা গুনে গুনে দাও। মেয়েটি লাবণ। সবার ছোটো। ইস্কুলে যায় আসে। তার তেমন ঝক্কি নেই এখনও অব্দি। তবে বলা যায় না, হাড়ে শেকড় গজাতে কতক্ষণ। বউয়ের হাঁপানি—অ্যাজমার ধাত। হোমিওপ্যাথ খায়।—এইসব তিতিক্ষায় আর জ্বালায় ত্রিলোচনের শরীর ঝাঁ ঝাঁ করে জ্বালা পোড়া করে। একদিন শখ করে যে মিনিবাস চড়বে, হিঙের বড়ি দিয়ে ট্যাংরা মাছ খাবে, আশায় আশায় লটারির টিকিট কাটবে তার উপায় নেই। চোখে শুধু ঝাঁক ঝাঁক মশার মতো ছুটে ছুটে আসে হতাশা। তা ক্রমে যেন ধ্বংসের দিকেই বাঁক নেয়।

কানে গুঁজে রাখা বিড়িটি দুই আঙুলে রগড়ে, মুখে একটু ফুঁ দিয়ে, ফস করে লাইটার জ্বালে ত্রিলোচন। গ্যাস নয়, পুরাতন কালের কেরোসিন ভেজা ন্যাকড়া, পাথরের গুণে আগুন জ্বলে ওঠে। এবার হণ্টন—হাঁটা দাও বটে।

একটা সময় পর্যন্ত দেখে, এখন একেবারে হাল ছেড়ে দিয়েছে ত্রিলোচন। কে খাবে কে পরবে, সংসারের খবর জানে না সে। —জন্ম দিয়ে দিয়েছি, এবার সব চরে খাক—। করে খাক। কাঁচাপাকা চুল—দাড়ি, খড়ি ওঠা চেহারা। সেইসব ফিকে চুলে চিকন রোদ খেলা করে। একটা মাত্র ছোটো, সবুজ, দুর্জ্ঞেয় টিয়া-পাখিকে খাঁচার ভেতর শেকল দিয়ে বেঁধে খাঁচাটি নিয়ে লোকটি ধর্মতলায় এসে

বসে। তারপর নীল আকাশের নিচে নানা রকমের খেলা চলতে থাকে।

এক একটি লোক আসে, টাকা দেয়। আর পাখি বলতে থাকে তাদের ভবিষ্যৎ। কার ভাগ্যে কি আছে। সাদা কাগজে লেখা কয়েকটি ভাঁজকরা পত্র থেকে ঠোঁটে করে একটিকে বেছে তুলে নেয় পাখি। তার ভেতর যা লেখা আছে ভাগ্যে তাই হবে। অবধারিত ফল। এ পাখি দৈবশুদ্ধ,—স্বয়ং ভগবানের এজাহার বয়ে এনেছে। ফলত মানুষ ছেড়ে পাখির সঙ্গে জাবন শুরু করেছে ত্রিলোচন। পাখিই তার জীবন। তার সঙ্গেই সময়। জিজ্ঞাসা। ভাব। বিদ্রূপ। জলে স্নান করিয়ে পাখিকে রোদশুকনো করতে করতে আপন সুতোয় টান অনুভব করে ত্রিলোচন। পাখির ঠোঁটের রঙ লাল, তাই কোমরে বেঁধে রাখা ঘুনসিতে জোর পায় সে। পাখি তাকে পথ দেখাচ্ছে, শেখাচ্ছে, হাসাচ্ছে, কাঁদাচ্ছে। ভাঙা ভাঙা মোলায়েম অনুনয়ের গলায় কথা বলে ত্রিলোচন। কখনো সেই নাকিসুরে আঁড়-বাঁশির খেয়াল ভেসে আসে। পাখিও সমানতালে সানুসাঙ্গিক কথা বলে। সে পোষ মেনেছে, হার মেনেছে মানুষের কাছে। ভালোবেসেছে।

তার জন্য অবিশ্যি কম সইতে হয়নি লোকটিকে। স্বজনহীন, বন্ধনহীন বেঁচে থাকায় একটা টিয়াপাখিই যে তার জীবনের সম্বল। আদর করে বুলি শিখিয়েছে। এখন রাতে মাথার দিকে, ভোরে যেন ডেকে ডেকে ত্রিলোচনের ঘুম ভাঙায় পাখিটা। ট্যাঁ, ট্যাঁ, ট্যাঁ-ওঠ-ওঠ-ওঠ। ট্যাঁ-এ্যাঁ, এ্যাঁ—ত্রিত্রলো—চো-ও ন। সারাদিন কাজ করতে করতে অথবা কাজের ফাঁকে পাখির সঙ্গে গল্প করে ত্রিলোচন। সে কত রকমের গল্প। রূপকথা, সেক্স-ভায়োলেন্স বা দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির গল্প। জ্যোতি বসুর শ্রাদ্ধ। মশা কামড়ে ডেঙ্গুজ্বরের গল্প। যুদ্ধ বা কত দুঃখের কথা, কত পুরনো কাসুন্দি স্মৃতির মন্থন। কখনওবা মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাকিয়ে থাকে ত্রিলোচন। ত্রিলোচন দীক্ষিত। —বি. এ। —এক্স্ মেশিন অপারেটর—আগরওয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস। সে কোম্পানি এখন উঠে গেছে। তার জায়গায় বসেছে মাল্টি স্টোরেড বিল্ডিং। সে কথা থাক।

এইভাবে পাখিটির ওপর নির্ভরতা বাড়তে বাড়তে উঠল চরমে। ত্রিলোচনের প্রেমালাপের ভাব দেখে লোকে মজা পেতে লাগল। লোক আসে, পাখিটিকে দেখে যায়, টিপ্পনি কাটে ত্রিলোচনকে নিয়ে। তাতে অবিশ্যি কর্ণপাত করে না সে। জগতে কত লোক কত কথা বলবে সে সব কথা কানে তুলতে গেলে আর চলে না। পাগলে কি না বলে। ছাগলে কি না খায়। পাখিকে ঘিরে ক্রমে তার জীবন স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল হয়ে ওঠে। এইভাবে একটি পাখি তার হাড়ে পাঁজরে

কলধ্বনি তুলে বয়ে যায়। বিশ্বাস বাড়ে। আনুগত্য ঘন হয়। স্পর্দ্ধিত অহঙ্কারের মতো পাখিটি তার জীবনীশক্তির আগায় বসে ব্রহ্মাণ্ডকে পরিচালনা করে। লোকটা ধীরে ধীরে আত্মগত স্তব্ধতায় চলে যায়। পাখি তার রক্তে পরিণত হয়।

এইভাবে চলছিল। হঠাৎ এক সকালে ত্রিলোচনের পিছনে লাগল একদল ছেলেছোকরা। তারা রকে বসে। আড্ডা মারে। শীতকালে চাঁদা তুলে সরস্বতী-পুজো করে। গরমের দিনে বিনে পয়সায় জলসত্র খোলে।

হাঁটছিল ত্রিলোচন। তার কাঁধে পাখির খাঁচা।

এ খুড়ো—

ত্রিলোচন চোখ তুলে তাকায়। বছর ১৮ হবে—একটা ছোঁড়া। তার হাসিতে চটুল আঠা, সে কাছে এলো। সরাসরি বলল, আছো কেমন?

এই আছি আর কি—

না, অনেকদিন দেখছি না এ-পথে, ভাবলাম—

ছেলেটির কথার ধরনে বোঝা যায় বেশ বখাটে, মজাড়ে। মতলববাজ। —পাখির খবর কি?

এই তো খাঁচায়—

তা—কত করে ছোলা খায় মাসে?

কেজিটাক—

ফেরত দেয় কি রকম?

ওই চলে যায় আর কি?

লোকে বলে পাখিটার সঙ্গেই নাকি তোমার পিরিত?—ছেলেটি আগল ছাড়া হাসে। তাকায় দূরে একটি ভাঙা স্কুলের মেঝেতে বসে থাকা বন্ধুদের দিকে। মজা করে। ত্রিলোচন ভয় পায়। একালের ছেলেরা। এই পথই তার নিত্য যাতায়াতের পথ। সে গুছিয়ে নিয়ে তাই বলার চেষ্টা করে,—মানুষের সঙ্গে আর হল কই ভাই। ঘরের পাখি খায় আর বনের দিকে চায়। তাই বারের পাখিরই সঙ্গ ধরেছি।

এই বাসায় ঝুটা নেই তো?

ঠিক তাই।

একটা বিড়ি দাও দিকি—

হা নেও।

এবার বল—

এ জিনিস কখনো বিশ্বাস ভাঙবে না ভাই।

মরার আগে পর্যন্ত ছেড়ে যাবে ভেবেছ ?

এমন ভালোবাসাটি আর পাবে কোথায় ?

পোষ মেনেছে বলছ ?

মেনেছে বলে। এক পলক চোখের আড়াল হলেই হল। চিল্লিয়ে হাট জড় করবে—

তবে খুড়ো পায়ে শেকল পরিয়ে রেখেছ কেন ? এ তোমার ভারি অন্যায়। পায়ে শেকল লাগিয়ে কি আর ভালোবাসা হয়। খুলে দাও শেকলটি। দেখি কত তোমার মনের জোর ? দেখি পালায় কি থাকে ?

চকিতে অন্তরাত্মা নড়ে ওঠে ত্রিলোচনের। স্থির হয়ে যায় তার ঠোঁট। হঠাৎ তরঙ্গ উঠে থেমে যায় মনে, কোনো সমুদ্রে এখন উত্তর ঝড়ের লীলা। সে দ্রুত হাঁটতে থাকে। ছেলেটি হেসে ওঠে এবং সরে যায়।

একটু দূরে এগিয়ে গিয়ে ত্রিলোচন অনুভব করে আবার বাতাস স্থির। শূন্যে ব্যোম কেবলমাত্র জীবিত। সে একটি লাঠিতে ঝোলানো খাঁচাটি পিঠের দিক থেকে চোখের সামনে আনে। ছাখে অবলা পাখিটিকে। জ্বলজ্বল করছে চোখ। ঠোঁট দুটি পুরু। সে তার অতীত জানে না, আগামী জানে না। চাউনিতে শুধু বিনম্র ছায়া। ঠিক যেন ত্রিলোচনের মেয়ে লাবণ।

চকিতে ত্রিলোচনের চোখ চলে যায় পায়ে বাঁধা শেকলটার দিকে। মরচে পড়েনি তো ? কত রোদ জল পড়ে এই লোহার শেকলে। কতদিনের পুরানো, রোজই পাখিটি ঠোক্কর মারে বারংবার। কমজোরী হয়ে পড়েনি তো ?

হাঁটায় মন থাকে না। মন চলে যায় শেকলে। বিষ মনে মনে বর্তায়। ধর্মতলায় বাণিজ্যক্ষেত্রে মন বসে না ত্রিলোচনের। লোক আসে, লোক যায়। পাখি তাদের ভাগ্য বলে। ঠোঁটে করে তুলে নেয় ভাঁজ করা সঠিক কাগজটি —ত্রিলোচনের খালি মনে হয় —বাড়িয়ে দেওয়া ছোলাটি খাবার লোভে পাখি ঠোঁট বাড়ায়। তখন সে তো যে কাগজটি কাছে পাবে তাই তুলবে ঠোঁটে। কে ঠকছে আর কে ঠকাচ্ছে কিনারা করতে পারে না লোকটা।

সে বাড়ি ফেরে। একদিন যায়। দুদিন যায়। দিন যায়। রোজ সকালে বিকালে দুপুরে পারলে কতবার যে শেকলটি জরিপ করে ত্রিলোচন তা সেই জানে। বউ হঠাৎ খেঁকিয়ে ওঠে, আবার একটা নতুন শেকল কিনলে যে ?—পয়সা কি মাগনা আসে নাকি ?

চেঁচিও না দেখি—

চেঁচাবে না মানে? কি মনে কর তুমি—

অনেক দিনের পুরোন হয়ে গেল। মনে হল মরচে ধরেছে। যে কোনো সময় কেটে যেতে পারে। তাই—

আগাম কিনে এনে রাখলে। বুড়ো বয়সে তোমার এমন ভীমরতি হচ্ছে কেন বলো তো— । তারপর বউ কান্না আর দীর্ঘশ্বাস ছড়িয়ে সংসারের কাজে চলে যায়।

রাত্রে ঘুমের মধ্যে মরচে ধরা শেকলের স্বপ্ন দেখে ত্রিলোচন। কোথা থেকে পাখির গায়ের বোটকা গন্ধ ভেসে আসে। স্বপ্নে পাখির পেটে গেলা সমস্ত ছোলার দানায় প্রথমে অঙ্কুর পরে গাছ গজিয়ে যায়। ত্রিলোচনের মনে হয় এ গাছ নতুন। সে আগে কখনো দেখেনি।

ঘুম ভেঙে যায়। আবার ধরে। আবার ভেঙে যায়। ফের ধরে।

এইভাবে এক সকাল আসে। শীতল ও স্নিগ্ধ সকাল। মরুভূমিতে যেন আশ্চর্য বন্ধুর মতো এই সকাল।

ঘুম থেকে উঠে ত্রিলোচন যথারীতি মাথার সিথানে রাখা খাঁচার দিকে তাকাল। দেখল দরজা খোলা—পাখি নেই। একা শেকলটি পড়ে আছে মৃত।

চিৎকার করে ওঠে ত্রিলোচন। ক্ষেপে যায়। চোয়ালটা প্রসারিত করতেই দেখতে পায় তার হ্যালাখ্যাপা মেজ ছেলে ঢপাকে। সে ইঙ্গিতপূর্ণ হাসছে। 'ঢপা, ঢপা রে—তুই—' বলে ত্রিলোচন খর পায়ে দৌড়ে যায় মেজ ছেলের দিকে। গিয়েই গলাটি টিপে ধরে। ঢপার বয়স আর কতই বা হবে, কচি নাদান ছেলে। সইতে না পেরে তার চোখ শরীর ঠেলে আমড়া আঁটির মতো বেরিয়ে আসে। দৌড়ে আসে বউ। বউমা। মেয়ে। ততক্ষণে ঢপা আঙুল তুলে আম গাছটা দেখিয়ে দেয়। ত্রিলোচন ঝড়ের মতো বয়ে যায় আম গাছের দিকে। নিচে থেকে তাকিয়ে দেখে গাছের ডালে টিয়া পাখি কানুশ্যামের মতো হাসছে। চন্দ্রাহত রাইকিশোরীর কানুশ্যামটি যেমন। মাথা ঠাণ্ডা হল ত্রিলোচনের। সে ঘরের ভেতর গিয়ে খাঁচাটি নিয়ে আসে তারপর গাছের তলা থেকে খাঁচাটি পাখির দিকে তুলে ধরে ডাকতে থাকে—আয়। আয়। আয় মিঠু—আয়—আয়।

তাহলে জানা গেল পাখির নাম মিঠু। ছোটো একটি আমবাগান। ১৮/২০টি আমগাছে ভরা। কোনো একসময় এই আমবাগানের মালিক ছিল টাকি রাজ-পরিবার। অধুনা উত্তর চব্বিশ পরগণার বসিরহাট থানার শ্রীযুক্ত অমিয় প্রকাশ চৌধুরীর অধীন এই আমবাগান। ফলের মরশুমে ঝুড়ি ঝুড়ি আম চালান যায় বিভিন্ন শহরে। শেলদা কোলে মার্কেট, লালগোলা হয়ে বাংলাদেশ। সেই আম

বাগানের একটি গাছ থেকে আরেকটি গাছে লাফাতে থাকে পাখি। কিছুতেই খাঁচায় আসে না। ত্রিলোচন প্রমাদ গোনে। একটি গাছে উঠে চকিতে নেমে পড়তে হয় তাকে। তখন খাঁচা হাতে অন্য গাছটি তার লক্ষ্য। পাখির টানে তাকে যেন মানুষের পূর্বপুরুষ মর্কটের মতো লাফাতে হয় গাছে গাছে।

সকাল যায়। দুপুর যায়। বিকেল যায়। বাড়ির লোকজনেরা আসে, ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চায় ত্রিলোচনেকে। কিন্তু ত্রিলোচন নাচার। সে কিছুতেই যাবে না। পাড়া প্রতিবেশী লোকজন জমে যায়। গাছের তলা রমরম করে। হাসি ঠাট্টা টিপ্পনির খেলা চলে। কেউ মজা পায়, কেউ বেবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখে ত্রিলোচনকে। লোকটা ক্ষেপে গেল নাকি?

সন্ধে আসে। আঁধার ঘন হয়। লোকজনেরা সব ফিরে গেছে যে যার ঘরে। পৃথিবীতে কোনো নিয়মের কোনো ব্যতিক্রম নেই। শুধু একা ত্রিলোচন গাছের তলায় একটি জীবন্ত আবছায়ার মতো দাঁড়িয়ে থাকে, হাতের খাঁচাটি যেন তার মহাজীবনের টর্চলাইট।

বড়ো ছেলে কালু আসে। তখন রাত নটা বেজে গেছে। গাছের তলায় বাবা নেই। গাছের দিকে টর্চ ফেলে কালু দেখতে পায় একটি গাছের শক্ত ডালে বসে তীব্র চোখ মেলে আরেকটি ডালের দিকে তাকিয়ে আছে ত্রিলোচন। ডালে পাতায় কোথায় হারিয়ে আছে টিয়াপাখিটি—দেখতে না পেতে পেতেই চোখে পড়ল কালুর। সে বলে উঠল, বাবা ঘরে এসো।

কোনো জবাব এলো না।—

নেমে এসো। পাখি কোথাও যাবে না। কাল সকালে আবার এসে না হয় ধরবে।

এবারও কোনো জবাব এলো না। শুধু দেখা গেল ত্রিলোচন কটমট তাকাচ্ছে, টর্চের আলো পেয়ে তার মটর দানা চোখ যেন সহসা ছুটে ছুটে নিচের দিকে নামতে লাগল।

অগত্যা বাধ্য হয়ে কালু ঘরে ফিরে গেল। ঠিক তখনই আকাশ ছেপে জ্যোৎস্না নামল। গাছের ভিড়েও স্পষ্ট হয়ে উঠল টিয়াপাখির সবুজ হাতছানি। সে রঙ আকাশ তলায় জ্যোৎস্না আর আঁধারের সঙ্গে মিলে মিশে অন্য অলীক রঙ ধারণ করল। রাত চলে যেতে লাগল রাতের গভীরে। ত্রিলোচন ত্রিলোচনের গভীরে।

পরদিন সকালে বাপকে ফেরাতে এসে বড়ো ছেলে কালু দেখল গাছে পাখি বা ত্রিলোচন কেউ নেই। (মাধ্যাকর্ষণের টানেই বুঝি) একটি আধনোংরা ধুতি ঝুলছে গাছের একটি মগ ডাল থেকে। পড়ে গেল ত্রিলোচন!

জীবজগতের লীলাখেলা

গভীর রাতে আনন্দপুরের নদী সাপের মতো লিকলিকে হয়ে বয়ে যায়। আর তার অববাহিকায় বালির পৃথিবী সদ্য বিয়ানো মায়ের মতো ফ্যাকাশে। জ্যোৎস্না নেমেছে উবু হয়ে, কিন্তু বহুযুগের জলস্রোত এসে ধুয়েমুছে ঝকঝকে করেছে এখানকার মাটি। পলি নেই, কেবল রুপার কুচি বালি। কিন্তু বাঁজা নয়। শসা, ফুটি, তরমুজ, কুমড়ো—এখান থেকে চালান যায় চন্দ্রকোণারোড, গড়বেতা, গোয়ালতোড়। সন্ধের পর নদীর হিম হাওয়া উঠে এসে চরাচরের মান ভাঙায়। শসা গাছের হলুদ ফুলটির সঙ্গে উত্তরের আবাগী হাওয়ার একটা ভালোবাসাবাসির খেলা চলে। খুব দুপুরে চাষীরা যখন পেটের তাগিদে ঘরে যায় তখন আকাশ থেকে নেমে আসে ঝাঁকে ঝাঁকে হরিয়াল, ঘুঘু—বালির ক্ষেতে নেমে সাধের ফলের বদলে তারা যেন মুঠো মুঠো বালি খায়। রুপার বালির ভেতর যাদু আছে, নইলে ফি সন এমন গর্ভবতী হয় কি করে। আর নদীর পাড়ে যে বটগাছ তার ছায়ায় বসে চাষীরা কারবারীদের সঙ্গে দরদস্তুর করে। এক আনা পয়সার টানাপোড়েনে তাদের মুখ ভার হয়ে যায়. কখনো সম্পর্কে চিড় ধরে। গ্রামটির ইতিহাস মোটামুটি এই।

ঠিক ভরদুপুরে একটিমাত্র প্রাণী বটগাছের ছায়ায় বসে বসে ফসল বিল পাহারা দিচ্ছিল। নগেন রায়ের ছোটো খোকা ঝণ্টুর গোঁফের রেখা উঠেছে সবেমাত্র। মাঠের ফসল চুরি করে অসৎ মানুষেরা। এই গ্রামে সিনেমার পত্রিকা এসে গেছে। খোকাটি স্কুলে পড়ে। পাতা উল্টেপাল্টে ফসল পাহারা দিচ্ছিল সে।

বিঘের পর বিঘে জুড়ে তরমুজ পেকে আছে। কখনো কাক পাখি এসে ঠোক্কর মারে। দুপুরের রোদ খেলছে মাটির ওপর, ভরা যুবতীর মতো গনগনে তার আঁচ। শসা গাছে নতুন ফুল এসেছে। প্রতি রাতেই চুরি হয়ে যাচ্ছে বস্তা বস্তা মাল।

সারাদিন যায় কোনোমতে। কোনো ছোঁড়া মাঠে ঢুকে গিয়ে শসা তুলে খায় বড়োজোর। গোরু ঢুকলে সমূলে সর্বনাশ। ছোটো খোকা ঝণ্টু, বটগাছের ছাওয়ায় বসে পাহারা দেয়, আর বাপের আড়ালে বিড়ি ফোঁকে। কখনো তিনু বামুনের সোমত্ত মেয়েটা এদিকে এলে তার হাতে শসা তুলে দেয়। বলে, লে, খা—। মেয়েটা যখন তার চিকন দাঁতে কচকচ করে কাটে সবুজ ফলটির বুক পিঠ পেট তখন ঝণ্টু শুধু হাসে, আর তাকায়। সে চোখে তাকে তখন আর পাহারাদার বলে মনে হয় না। শুধু মনে হয় ক্রমশ সে যুবক হচ্ছে। শরীরে যৌবনের ক্রিয়া চলে, পেশী শক্ত হয়।

এ ছাড়াও নগেন রায়ের আনন্দপুর চকবাজারে ভূষিমালের দোকান আছে। বড়ো ছেলে নাণ্টু দোকানে বসে সওদা বিক্রি করে। খুব গরম নামলে চাষের তরমুজ কেটে সে চিনি দিয়ে খায়। নগেন রায়ের বয়স প্রায় ষাট উতরে গেছে। বাড়ির সামনে গেল বৈশাখে গোকুলধামের উদ্বোধন করলেন জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান লাটু মিত্তির। এখন সেখানে কৃষ্ণলীলার নামগান হয়। গুড় চিঁড়ের ভোগ হয়। সেই ভোগে শসার কুচি ঢেলে বিতরণ করা হয়।

কিন্তু রোজ সকালে নগেন রায় একবার মাঠে যান, এটা তার একটা অভ্যেসের মতো। সাত পুরুষের সংসার চলেছে এই কৃষির ওপর। বড়ো ছেলে বিয়ে করেছে হুগলী শ্রীরামপুরে। বেয়াই মশায়ের তিনখানা কারবার। সেই কুটুমবাড়ির সুবাদেই রায় বংশের এই ব্যবসার হাতে-খড়ি। রোজকার মতো আজকেও মাঠে ঢুকে পড়ে আকাশের দিকে তাকালেন তিনি। ছোটো খোকাটার লেখাপড়াটা আর বুঝি হল না। তার নির্লোম টাক মাথাটিতে সকালের হাওয়া খেলে যায়। একি! আজকেও তরমুজের পিঠ ভেঙে খেয়ে গেছে কে? এই চুরি রুখতেই হবে।

রক্তাক্ত তরমুজটি পড়েছিল মাঠে। পৃথিবীর সরস মাটি থেকে রস টেনে নিয়ে গাছ তার ফলকে মহিমময় করেছে। সেই ফল থেকে মিঠে রস এসে পড়েছে মাটিতে। পিঁপড়েরা খায় আর ঘোরাঘুরি করে। নগেন রায় তরমুজ বিল থেকে শসা ক্ষেতের দিকে এগোলেন। সেখানেও এক চিত্র। বিশাল ক্ষেতে মোটাসোটা ফলগুলি চুরি হয়েছে রাত্রিতে। এবার জাগরণ চাই।

পঞ্চায়েতে নালিশ করেছিলেন, কিন্তু কোনো সুফল পাননি তিনি। কৌশলে হেসেছে তারা, জমিজমা বেশি থাকলে মানুষ জোতদার বনে যায়। এবার তিনি প্রধানকে বলে এলেন, রাত্তিরবেলা লোক দেখলেই বন্দুক ছুঁড়ব। প্রধান জানেন আগ্নেয়াস্ত্রের লাইসেন্স আছে নগেন রায়ের।

হাবুল, ধীরা, বিপিন আর কোটাল এরা চারজন এই নদীক্ষেতের মজুর। বালি ক্ষেত্রটির পরই শুরু হয়েছে ধানি-মাঠের। কাঠার পর কাঠা এখানে ফোটে সবুজ ধান। সোনার ধান আর শরতে মহাকাশের নিচে কাশফুল মাঠে। সন্ধের পর আখ বিলে শেয়াল ঢোকে। প্রকৃতির হাওয়ায় ওড়াওড়ি করে ভীষণ গ্রাম্য কিছু জোনাকি। পিছনদিক থেকে তাদের সর্বাঙ্গ তখন পৃথিবীর কল্যাণের জন্য হু হু করে জ্বলে।

আজ দুপুরে যখন চার মজুরে পাইকারী লরিতে মাল তুলতে গেল তখন নগেন রায় তো রেগেই আগুন। মাত্র পাঁচ কুইণ্টাল মাল, এতে তো যাতায়াত পোষাবে না, আজকের মাল বাঁকুড়া বিষ্ণুপুর চালান যাচ্ছে। নির্দেশ রইল হাবুল আজ থাকবে ঝণ্টুর সঙ্গে। বটগাছের নিচে তৈরি হল খড়ের ডেরা। খুব সন্ধ্যায় লম্ফ জ্বলে উঠল সেখানে। লাঠি আর টাঙি নিয়ে দুই পাহারাদার ক্ষেত্রপতি হয়ে জেগে রইল।

জ্যোৎস্না লাট হয়েছে চতুর্দিকে। রাতের আকাশে বাদুড় উড়ে গেলেও দেখা যায় স্পষ্ট। এখন রাত, ফুলের মধ্যে গর্ভসঞ্চারের আয়োজন চলে। শসা গাছের লতায় লতায় ফুলের পেট ভেঙে কচি শসারা জাগছে এখন। বৌ ছেলের কথা মনে পড়ে হাবুলের। হাই উঠে আসে শরীরের গুপ্ত জায়গা থেকে। চোখ জ্বলে খিদেয় বিতৃষ্ণায়।

ঝণ্টু জিজ্ঞেস করল, ঘুম এসেছে নাকি?

হাবুল জ্যোৎস্নার দিকে তাকাল প্রথমে, তারপর দেখল আকাশের খেলা। বলল, ভোর হয়ে গেছে। এবার একটু ঘুমনো যাক। এই বলে কোনো কথার অপেক্ষা না করেই হাত পা ছড়িয়ে দিল খড়ের ওপর পেতে রাখা শতরঞ্চের ওপর। কয়েক পলক পরেই নাক ডাকল তার, তারপর টানা ডাকতে থাকল।

এখন জ্যোৎস্নার রঙ অনেকটা নীল। সেই নীল মেঘের নিচে সবুজ গাছের লতায় ধরে আছে কাঁচা রঙের গোল, লম্বা ফলগুলি। জেগেছিল ঝণ্টু। একদমক ঘুমিয়ে হাবুল উঠলে সেও ঘুমবে এই ধরনের একটা ইচ্ছে। এই সময় রাত-পাখি ডাকল আকাশ কেটে। কাঁপল ভুবন। ঝণ্টু দেখল খুব ধীর পায়ে কে একজন এগিয়ে আসছে নদী-পার থেকে। লম্ফর বাতি কমিয়ে আনল সে। মেরুদণ্ড খাড়া করে দাঁড়াল টান টান করে। তারপর বটগাছের পিছনদিক ধরে সেই অজানা-লোকটিকে সামনে রেখে পা চালাল। একটু এগোতেই বুঝতে পারল, লোকটি আসলে মেয়েমানুষ।

পলিথিনের হালকা বস্তা তার হাতে। এবং স্বাস্থ্যবতী। গাছে হাত দিচ্ছিল চোর ফল ছেঁড়ার জন্য, পিছন থেকে খপ করে হাতটি ধরে ফেলল ঝণ্টু। দেখল বউমানুষ, অর্থাৎ চুলের মাঝামাঝি এই ক্ষেতের তরমুজের হৃদয়ের মতোই টকটকে লাল দাগ। প্রথমে ঝণ্টুর হাতের মধ্যে ধরা পড়ে হাতটি কেঁপে উঠল একবার। তারপর চেয়েচিন্তে একটু হাসল বউটি। ঝণ্টুর বড়ো বড়ো চোখ যেন লম্বা হয়ে গেল।

মৃদু হাওয়ায় উড়ে গেল আঁচল, সটান নদীর দিকে। চমৎকার জ্যোৎস্নায় দাঁড়ালে শসা বা তরমুজের কথা আর মনে থাকে না মানুষের। বরং রক্ত জেগে ওঠে। ঝণ্টু দেখল মেয়ে মানুষের বুক। বউটি বলল, খেতে ভালোবাসি খুব। কেনার পয়সা কই—

এই অচিন আঁধারের মাঝামাঝি বিস্তৃত একান্ত মাঠটি যেন কানে কানে কি বলল ঝণ্টুকে। যেন অদ্ভুত একটা ডাক শুনতে পেল সে। নরম মাটির ওপর ঘাস। ঝণ্টু বলল, বেশ কথা তো। খেতে মন করে খাবে বই কি। কিন্তু এই রাতে, আমি না থেকে যদি বাবা থাকত—

চোখের টানাপোড়েনে হ্যাঁচকা টান মেরে বউটি জিজ্ঞেস করল, কি হতো তখন।

ততক্ষণে দুটি মানুষ খুব কাছাকাছি। হাওয়া তখন নাতিশীতোষ্ণ। কি বলল ঝণ্টু শুনতে পেল না মেয়েটি। শুধু জানতে পারল কোনো কিছু। একটু কাঁপল, তারপর সেই হালকা পলিথিনের থলেটা ভরে তরমুজ নিল সে। উদার হয়ে গেল ঝণ্টু। দাতাকর্ণের মতো দেখল পৃথিবীকে।

নদীর চরে পা ফেলে ফেলে চলে গেল বউটি। কিছুদূর একসঙ্গে ঝণ্টু, তারপর ফিরে এলো ডেরায়। ততক্ষণে জেগে উঠেছে হাবুল। বিড়ি খেয়েছে একটা। লম্ফর বাতি তুলে দেখতে চেয়েছে সবকিছু। ঝণ্টু এলো কাছে। হাবুল বলল, কোথা গেছলেন।

খুব পরিচ্ছন্ন মেজাজ নিয়ে ঝণ্টু বলল, চাপ এলো খুব, ভাবলাম নদীর দিকে একটুন যাই, জল দেখতে যাই—। এখন হালকা লাগে, এবার ঘুমাই—

জাগল হাবুল কথা মতো। কিন্তু কোথা থেকে আবার ঘুম এসে গ্রাস করল তাকে। দুজনেই চেয়ে দেখল আলো পড়েছে মাঠে, সকাল হয়েছে, ঘাসের মাথা থেকে তখন পিঁপড়েরা মিঠে শিশির চুষে খাচ্ছে। ঝণ্টু আড়মোড়া ভেঙে বলল, শেষ রাতে চুরি গেল না তো। খুব পরাক্রমতার গলায় নিজের অপরিচ্ছন্ন ভুঁড়িটিকে বার দুই নাচিয়ে হাবুল বলল, নাহ্—না।

তবু মাঠের ভেতর ঢুকে গিয়ে নগেন রায় দেখলেন, রোজকার মতো আজকেও সেই মুখভাঙা তরমুজ পড়ে আছে। কাল রাতেও তাহলে কেউ এসে খেয়ে গেছে। ছেলেকে জিজ্ঞেস করলেন তিনি। শেষরাতে ঘুমের কথা বেমালুম চেপে গেল ঝণ্টু। বরং চোখে-মুখে দৃঢ়তা নিয়ে বলল, সারারাত ঠায় জেগে ছিলাম। দু'জনেই। কই কেউ তো আসেনি। মনে হয় শিয়ালে খেয়েছে—

অবাক চোখে ভ্রূ-কুঁচকালেন ঝণ্টুর বাপ। বললেন, শিয়াল আবার তরমুজ খায় নাকি? খুব জোর দিয়ে ঝণ্টু বলল, খাবার জিনিস না খাবে কেন, কিরে হাবলা, বল না শিয়াল খায় কিনা? তুই আগে যে ঘোষেদের ঘরে ছিলি, কি দেখেছিলি—? হাবুল চটপট বলে ফেলল, হ্যাঁ বাবু, খুব খায়।

একটা নিমডাল ভেঙে নিয়ে দাঁত ঘস্‌ছিলেন বাবু। বড়ো ছেলে কতবার যে বলে, বাবা আমাদের কি আর সে দিন আছে। তোমার তো একটা পেট্টিজ আছে, কলগেট পেস্ট দিয়ে দাঁত মাজতে পারো তো। নগেন রায় চিরকাল যা করেছেন তা তার সাত পুরুষের দান। গাছের ডাল আর নদীর জল—শুধু শুধু পাঁচটা টাকা খসাতে যাব কেন?

কৃপণ বলে তল্লাটে বহু রসকথা চালু আছে তাঁকে নিয়ে। বাগানে এতো সব্জি হয়, ফল হয়, পুকুরে এতো মাছ। খেতে জানে রায়বংশ! টাকার কুমীর, বিকোবে আর টাকা গোছাবে। মাঠ থেকে ঘরে যাচ্ছিল ঝণ্টু। বলল, বাবা ঠাকমা বড়ো তরমুজ খেতে চায়। একটা তুলে নিয়ে যাই—

চটে গেলেন নগেন রায়। বললেন, খেয়ে খেয়েই তো এই হাল। টাকা ঢেলেছি যা উঠল কি ছাই। রাক্ষসদের পেটে আর কত ঢালি? তরমুজ আছে নাকি বিলে যে লে' যাবি—পরে খাবেখন। তোর মাকে গিয়ে বলবি, আদা দিয়ে চা করে রাখতে। বাহ্যি সেরে আমি যাচ্ছি।

তিনজন মজুর এসে সরু পাশনি কোদাল দিয়ে শসা, তরমুজ, কুমড়ো গাছের মাটি এপাশ-ওপাশ করে দিতে লাগল। ইউরিয়া, এমোনিয়া ফসফেট সার ঢালল গাছের গোড়ায়। তারপর রোদ বাড়ল, মাটি তেতে উঠল মাঠের, ধু-ধু নদীর তীরে পা ফেলে স্নান করতে এলো গ্রামবাসীরা। রায়দের এই প্রকাণ্ড ক্ষেত-বাড়ির দিকে তাকিয়ে তাদের চোখ টাটাল বৈকি।

বিরি কলাইয়ের ডাল, কাঁকুড়ের চচ্চড়ি, মৌরলা মাছের অম্বল দিয়ে ভাত খাচ্ছিলেন নগেন রায়। তার মাথায় কিছুতেই ঢুকছে না শেয়াল কি করে তরমুজ খায়। এই মাটিতে ধান বা গম হয় না। অন্য মরশুমে পতিত থাকে মাটি।

শিশুকাল থেকে তরমুজের চাষ দেখে আসছেন তিনি। ঠিক হলো আজ রাত্রে ঝণ্টুর সাথে ধীরা রাত জাগবে। লোকটার বয়স বেড়েছে ঠিক কিন্তু শরীরে তাগদ আছে। অন্দি-সন্ধির ধাত নেই, সৎ লোক হিসাবে গাঁয়ের পাঁচজন নাম করে।

কিন্তু মৃত্যুর চেয়েও ভয়ংকর যে রাত সে তো এলো আর চলে গেল। খুব সকালে নরম ঘাসের ওপর পা ফেলে ক্ষেতবিলটির দিকে এগোচ্ছিলেন নগেনবাবু। অঞ্চলের উপ-প্রধানের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। নদীর কোল থেকে এইমাত্র উঠে আসছেন তিনি, পায়ে এখনো কাঁচা জলের দাগ। বললেন, কি হলো রায়বাবু, চোর ধরা পড়ল ?

এমন সময় নগেন রায়ের চোখে পড়ল মাঠের ঠিক মধ্যিখানে আধ-খাওয়া একটি বড়োসড়ো তরমুজ রক্তাক্ত হয়ে পড়ে আছে। গতকালই রায় ভাবছিলেন পেকেছে তো তুলে নেওয়া যাক। আর এই একরাত্রে সতর্ক প্রহরার সামনেই কেমন খুন হয়ে পড়ে আছে। রাগে মাথায় শিস জলে উঠল তার। তবু নাকের পাটা, হাতের শিরা আর পিঠের মেরুদণ্ডটি সংযত করে উপ-প্রধানের দিকে তাকিয়ে কাষ্ঠহাসি হেসে বললেন, সে কি আর একদিনের কাজ। কতদিনের সাজানো ষড়যন্ত্রের চুরি, তো চোরের সাতদিন আর গেরস্থের একদিন,—ধরব যখন বলেছি.—ধরবই—

আরো দু-এক রাত কাটল, ছেলেমানুষ ঝণ্টু, বয়স আর কতইবা হবে—বড়জোর কুড়ি। আর চাকর-বাকর জনমজুর সব ব্যাটাই সমান। আজ রাতে কিন্তু জ্যোৎস্নায় যেন কোথা থেকে এসে মিলেছে অদ্ভুত এক হাওয়া। এই রায় পরিবারের চাষে বাসমতী, চামরমনি ধান ফলে, কিন্তু লরী আসে। সব ধান শালবনী গোডাউনে চলে যায়। বউ শুষারী, কাঁকুরে চালের মোটা দানা ভাত বেড়ে দিল গৃহকর্তাকে। ঝণ্টু দুধ দিয়ে ভাত খেল। শুষারী বলল, একরত্তি ছেলে, রোজ রোজ রাত জাগলে বাঁচবে কদিন। ক্ষেপি ঠাকমা তখন তুলসি তলায় মাদুর পেতে শিবায়নের গান গাইছিল। বাটামাছের মাথাটা দাঁতের ভেতর ভাঙতে ভাঙতে নগেনবাবু বললেন, আজ রাত্রে ওর সঙ্গে আমি থাকব, দেখি চোর কেমন করে ফলের মাথা ভাঙে। কে চোর, আজ একটা হেস্তনেস্ত চাই।

গভীর রাতে পৃথিবী দুলিয়ে গেল লক্ষ্মী পেঁচার ডাক। রায় জেগে আছেন। হাতের শক্ত গড়ানে মুখ বাড়িয়ে আছে ভীষণ দাপটের বন্দুকটি। মাঝে মধ্যে রায়ের সংশয় হয়, বহুকাল গর্জায়নি যন্ত্রটি। পাঁচ বছর আগে, পঁচাত্তর সালে মল্লিক বাড়িতে ডাকাত পড়লে ঘরের উঠোন থেকে তিনি একটা ফাঁকা আওয়াজ

করেছিলেন। এতদিনের অব্যবহারে বুলেটগুলি সেঁতিয়ে যায়নি তো! সে যাই হোক, বাতাস এখন শন শন করে শ্মশানের দিকে চলে গেল। ঝণ্টু বলল, বাবা আমাকে বন্দুক চালানোটা শিখিয়ে দাও না—। বাবা তখন তাঁদের বংশের হৃত গৌরবের গুণকীর্তন করলেন কিছুক্ষণ ধরে।

আকাশে মৃদু মেঘ, চাঁদের শরীর থেকে টস টস করে পুঁজের কোঁটা পড়ছিল। তাই ধোঁয়াটে আলোয় পৃথিবী একরকম ছিল। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে রাক্ষসের হাঁ নিয়ে যেন অন্ধকার এলো, গ্রাস করল একফালি রাঙানো কাস্তেটিকে, ত্রিভুবন কালো হয়ে গেল। সেই অন্ধকারে বন্দুকধারী বাপের পাশে টাঙি ধরে তীক্ষ্ণ শিকারীর মতো বসে আছে ঝণ্টু। মানুষ ঢুকলেই ঝাঁপিয়ে পড়বে বাপবেটায়।

এমন সময় কে আসছে, শন শন করে হাওয়ায় আসছে, শ্মশানের দিক থেকে যেন ভেসে আসছে একটি মানুষ। বন্দুক নামিয়ে রাখলেন নগেন রায়। নইলে মানুষ খুনের দায়ে কে যাবে জেল-হাজতে। টাঙি ধরলেন তিনি, সন্তর্পণে, পা টিপে টিপে নিঃশব্দে খুব কৌশলে এগোচ্ছেন, পিছনে কুড়ি বছরের বাড়ন্ত ঝণ্টু।... খুব ধীরে তাঁরা চোরের ঠিক পেছনে এসে দাঁড়িয়েছেন। ছোটো-খাটো গোল একটি পৃথিবীর মতো তরমুজ ধরেছে গাছে, গাছ শুয়েছে মাটিতে সর্বস্ব ঢেলে, তাই মনে হয় সবুজ সমৃদ্ধ এই পৃথিবীটি মাটির ওপর তামাশা দেখছে। তিনটি মানুষ এখন কি করে?

হাত বাড়াল চোর ধারালো টাঙির কোপ মারলেন নগেন রায়। মুহূর্তে কাটা হাতটি ঢুকে গেল তরমুজের ভেতর। বিকলাঙ্গ জীবনটি নিয়ে দৌড়ে উঠল চোর, পালিয়ে গেল। পা—পা—পা—পালিয়ে গেল। ধর ধর।

মানুষের আর তরমুজের রক্তে-মাংসে এক হয়ে মাঠটি এখন অপরাধীর মতো চুপ হয়ে আছে। হাতটি এমনভাবে ফলের ভেতর ঢুকেছে যেন গর্ভ থেকে বেরোবার জন্য শুধু হাত বাড়িয়ে ত্রাণ চাইছে মানুষ। নগেন রায় বললেন, যাক কাল সকালে ব্যাটা ধরা পড়বে ঠিকই। আমি ঘরে যাই ঝণ্টু, তুই থাক ডেরায়।

ঝণ্টু বলল,—ভয় পাচ্ছে যে—

বাবা ঝাঁঝিয়ে উঠলেন, কুড়ি বছরের জোয়ান ছেলে ভয় কিসের। এই বলে বন্দুকটি হাতে নিয়ে হনহন করে বাড়ির দিকে চলে গেলেন তিনি। ডেরায় ফিরে এসে লম্ফ উঁচিয়ে জেগে আছে ঝণ্টু। আজ আর চোখে তার ঘুম নেই। রাত শেষ হতে এখনো ঢের বাকি। বাতাসের দুলকি চাল, এদিক-ওদিক থেকে খসখস আওয়াজ ওঠে, সচকিত হয় ঝণ্টু। তারপর তাকিয়ে দেখে, নাহ্ কোনোদিকে

কেউ নেই। এইভাবে ঘণ্টা কয়েক চলল, তারপর ঠাণ্ডা হাওয়া এলো কোথা থেকে, পুবদিক ধুয়ো হয়ে এলো। এমন সময় আরেকজন কে যেন নদীর ধার থেকে ক্ষেত-বিলটির দিকে এগিয়ে আসছে। এখনো আঁধার, দেখা যায় না কোনো কিছু। শুধু এক অস্পষ্ট দিগন্ত দেখা যায়।

শুধু মানুষ আসছে, ঢুকে পড়ল তরমুজ খেতের ভেতর। ভয়ে বুক দুরুদুরু করল ঝণ্টুর। একটু এগিয়ে থমকে গেল সে। প্রাণের জন্য মায়া হলো। নিয়ে যায় তো যাক।

দূর থেকে তাকিয়ে দেখছিল ঝণ্টু। লোকটা এলো আর হুমড়ি খেয়ে পড়ল একটু আগে খুন হয়ে থাকা তরমুজটির উপর। সেখানেই মানুষের রক্তমাংসের হাত তরমুজের রসে মিষ্টি হয়ে আছে। কিংবা নির্দোষ তরমুজটি মানুষের লোনা স্বাদে লোনা হয়ে আছে। কোনোকিছুই বোঝা গেল না। কারণ যে খাচ্ছে, যার খিদে সেই বলতে পারে স্বাদ কেমন।

একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়ে রইল ঝণ্টু, যখন দেখল ভোজনপর্ব শেষ করে লোকটি পালিয়ে যাচ্ছে, মানুষটি কি মানুষের লোনা স্বাদ টের পেল না? অমন উৎফুল্ল হয়ে যাচ্ছে কি করে? পায়ে পায়ে একটু এগিয়ে গিয়ে ঝণ্টুর বুকটা ধড়াস করে কেঁপে উঠল, আরে এ যে ক্ষেপি ঠাকমা! খাবার লোভে চোর হয়ে গেল, মানুষ খেল!

পরম শ্রম

ট্রাকের নিচে উবু হয়ে শুয়ে গ্যারেজ-ম্যানের কাজ করেছে বিভু। তাই পোড়-খাওয়া জীবনের দাম কাকে বলে তা হাড়ে-হাড়ে চিনেছে। পৃথিবীর উপর এক-একটি অভিজ্ঞতা ক্রমশই তাকে রুক্ষ করে দিচ্ছিল। তবু মাঝে মাঝে এই আকাশ দেখে পালটে যায় সে। মনে হয় কেউ কোথাও আছে। একদিন মানুষ তার কাছে মনোরম হয়ে উঠবে। আর আজ, ফুলকপির সবুজ রূপটি দেখে আরেকবার মনে হলো, কেউ কোথাও আছে, নিশ্চয় এগিয়ে আসছে। এইসব ভাবনা মনের উপর ক্রিয়াপাত করে, কারণ সে দু'পাতা পড়তে শিখেছে। লেখাপড়া জানা মানুষের কাছে পৃথিবীর আলাদা একটা মানে আছে। নদীকে তারা শুধু নদী বলে মানে না। মনে মনে তার সাতটা মানে করে নেয় আর হরেকরকমভাবে বেঁচে থাকে।

এদিকে মাটির রঙ কালো, বিভু দেখল অদ্ভুত রঙের কুচিপাথর মেশানো। নোংরা পচা। বোটকা গন্ধ বর্ষার জল পেয়ে ক্ষেপে উঠেছে। তবে কলকাতার আবর্জনা খেয়ে ভিন মরশুমের ফুলকপি, ওলকপি, বেগুন আরো সব গাছের ভোল পাল্টে যাচ্ছে। তরতর শব্দে রোজই উদ্ভিদ বাড়ছে দু ইঞ্চি করে।

চালাবাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে বিভু দেখল সামনের মাঠে শকুন নেমেছে পঙ্গপালের মতো। তার ভাঙা পিঠ সোজা করে একটা ঢিল তুলে ছুঁড়ে দিল সে। পাখিগুলির কাছাকাছিও এগোতে পারে না ঢিল। এমন সময় একটা লরি পচা মাল এনে ঢালতে লাগল একেবারে নাকের গোড়ায়, বিভু বলে উঠল, শালা বজ্জাত!

ট্রাকের লোকটি বলল, ক্যায়া?

আগুন আছে? আর কী বলব?

হামনে শোচা কি—

কত ভুলই মানুষ করছে, কেই কি তার হিসাব রাখে! বিড়ি ধরাতে মন করল, ভাবলাম ট্রাকবালাকে ডাকি। এই বলে বিভু একটু হাসল। ট্রাকবালা একটা কৌটো বার করে পানপরাগ ঢেলে দিল বিভুর হাতে। ধূমপানের পরই এক অলীক গন্ধে ভরে উঠল বিভুর জীবন। মনে হলো, ট্রাকবালার মনটি খুব পরিষ্কার। আর জীবনটি সুখের।

ইধার নয়া? কি পহলে দেখনা নেহি?

হ্যাঁ, নয়া লোক। তিনদিন হলো এসেছি—

এই সময় মেঘলা আকাশকে আড়াল করে এক ফালি রোদ নেমে এলো পৃথিবীতে। পশ্চিম আকাশে ধূমের মতো মেঘ এতক্ষণ অপদেবতা হয়ে ডাকছিল শুধু। এখন সোনালী আলোর মুখে পড়ে কালিন্দি রূপ ধরেছে পশ্চিম দিগন্তে। বিভু বলল, আদি বাড়ি মেদিনীপুর।

মেদিনীপুর চেনে না ট্রাকবালা। ভিনমুলুক ছতরপুরের লোক। আজ বহু বছর কলকাতায় কেটে গেল। আর দেশে ফিরতে মন করে না। চল্লিশ বছর এই তরফে লরি চালিয়ে লোকটির কানের পাশের সবকটি চুল বিলকুল পেকে গেল। বিভুর পিঠে হাত রেখে সে বলল, আচ্ছাসে কাম করো।

হাঁটতে হাঁটতে বিভু চলে যায় ইস্টার্ন বাইপাসের উপর। তারপর ধাপার মাঠ। বহু লোকজন এখানে নোংরা ঘাঁটছে। হাতে লোহার শিক। শহর থেকে রাবিশ নামিয়ে দিয়ে যায় লরি। কখনো দাউ দাউ করে আগুনে জ্বলে ওঠে রাবিশ। কখনো পচে, আরো নোংরা হয়। আর সেই নোংরা ঠিকমতো ঘেঁটে দেখতে পারলে মূল্যবান কিছু না কিছু মিলে যায়।

এসব কথা বিভু শুনেছে দত্তদের কাছে। ছোটো দত্তর চাষবাড়ি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রথম যেদিন এলো সে, সেদিনই চারিদিকটা ঘুরিয়ে দেখিয়েছে দত্ত। এদিকটা গরু ছাগলের উৎপাত বেশি। নজরগলতি থাকলে মানুষ এসে ফাঁক করে দেয় মাঠ। ওদিকের মাঠে লোকজনেরা রাবিশ ঘেঁটে জিনিসপত্র খোঁজে। কত মূল্যবান হারানো জিনিস রাবিশের সঙ্গে লরিতে উঠে চলে আসে ধাপার মাঠে। বছর তিনেক আগে একটি মেয়েমানুষ নাকি পুরনো আমলের একটা গোল্ডেন নেকলেস খুঁজে পেয়েছিল। ষোলো ভরির মাল। উঃ! মেয়েমানুষটা বড়লোক হয়ে গেল!

এই ছোটো দত্ত লোকটি যে কম ধাপ্পা দিতে পারে না বিভু তা ভালোভাবেই জানে। তবু যার খাবে তার সঙ্গে বিবাদে আসতে ভয়। তাই বলেছিল, সত্যি?

আর ঠিক তখনই আরেকটা লরি এসে ঢেলে দিল পচা পয়মাল। লোকজন হা হা করে ছুটে এলো।

এই তিনদিন ওদের সঙ্গে মিশেছে বিভু। সেই সুবাদে আলাপও হয়েছে। কেউ কিন্তু মূল্যবান কিছু পায়নি। তবে সবাই শুনেছে, গত বছর বাগুইআটির একটা লোক নাকি একটা ভাঁজ করা একশ টাকার বাণ্ডিল পেয়েছিল রাবিশের মধ্যে। বাকি সবার অভাব। আর অভাব যাদের তাদের ভাগ্যে লবডঙ্কা। স্বভাব মন্দ।

গয়নার সঙ্গে বিভুর পরিচয় বিভুকে অবাক করেছিল বটে। কালো রঙের মেয়েটা শরীর-স্বাস্থ্যে বেশ। চোখ দুটি ধারালো করাতের মতো। ছেনালি কায়দায় সে গতর মোড়াতে পারে। কসবার টেনারি পট্টির দিকে কোথাও থাকে। ওদিকটা আবার ভালো করে চেনে না বিভু। গয়না বলল, চামার পাড়ার পরেই যে গলি তার শেষ ঘরটি—টালির ছাউনি।

নুন আর পাতিলেবুর রসে ধোয়া ভুট্টা খাচ্ছিল গয়না। গয়নার খুড়ি বেশ কিছু স্যালোফেন পেপার কুড়িয়েছে। হাতে চটের ব্যাগ। গোছাচ্ছিল বুড়ি। গয়না বলল, একটা পান দাও না খুড়ি।

কেনঅ, পান আবার কী হবে ?

মুখ রাঙাব।

বিভুর দিকে তাকিয়ে গয়না ছলবলিয়ে ওঠে। মেয়েটাকে ভালো লাগে বিভুর। মনে হয় জীবনে যেন তার কোথাও কোনো অভাব নেই। গলায় ময়লা গাদ বসেছে, আঙুল দিয়ে ঘষতে ঘষতে গয়না বলল, পান খেলে রস হবে।

আর পাঁচটা পুরুষের মতো বিভুও, পৃথিবীতে এত কিছু থাকতে মেয়েমানুষই তাকে টানে সবচেয়ে বেশি। কী জানি কিসের টান।—একটা ভাঙা ফুলদানি পেয়েছে সে। চীনেমাটির ফাটা ফুলদানিটার দিকে তাকিয়ে মনে হলো কে জানে কার ঘরের বস্তু। এমন সময় নোটন ছেলেটা ঝটিতে এসে বলল, এই লোকটা—ওদিকে গরু যে তোমার বাগান সাফ করে দিল গো।

সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে ওঠে বিভু। একটু পরে বাগান থেকে কচি কাঁকুড় তুলে এনে গয়নার দিকে বাড়িয়ে দেয়। গয়না না করে না। নিয়ে ঝোলায় পুরে রাখে। খুড়ি বিভুর দিকে তাকিয়ে জিগ্যেস করে, গাছের ফল বুঝি ?

মাথা নাড়ে বিভু। চলে যায় গয়না আর তার খুড়ি। একদিন আমাদের ঘরে এসো বাছা—এইমতো কিছু কথা বলতে বলতে চলে যায়।

আকাশের দিকে তাকিয়ে বিভু বুঝতে পারে দুপুর এইবার গড়িয়ে যাবে। ঘরে এসে ভাত বসাতে হবে তাকে। ছোটো দত্তের এই বিশাল বাগানের চালাবাড়িতে একা থাকে সে। খায়-দায় আর শোয়। ভালোই আছে। এখন আর শারীরিক পরিশ্রমের বালাই নেই।

সেদিনই রাত্রে আকাশ ছেপে জ্যোৎস্না নামল মাটিতে। তারপর হঠাৎই কোন্ দিক থেকে কী যেন হয়ে গেল। পশ্চিম পারে আকাশকোণে জমে থাকা সকালের সেই ঘন মেঘ ক্ষেপে উঠল গভীর রাতে। ভেসে গেল কলকাতা শহর। শহরের পরিত্যক্ত এলাকার চার দেওয়ালের মধ্যে শুয়ে শুয়ে বৃষ্টি পতনের ঢিমে শব্দ শুনল বিভু। আটার রুটি খেল গুড় দিয়ে। তারপর গয়নার কথা ভাবল কিছুক্ষণ।

এই সময় শুধু শরীর কথা বলে। কয়েকদিন আগে আর একটা মেয়েকে ঘিরেই ছুটে বেড়াত বিভুর মন। কাশীপুরের উদ্যানবাটীর মেয়ে। কিছুদিন পিছন পিছন ঘুরে সে জানতে পেরেছিল, এ হওয়ার মানুষ নয়। কী গভীর কষ্ট যে পেয়েছিল! বুর্বক্ মন যখন-তখন উচাটন হয়!

টালির ছাদের ছোট্ট ঘরটির মাথায় চটর-পটর বৃষ্টি। উত্তরে সল্টলেক সিটি দক্ষিণে সাউথ ক্যালকাটা। মাঝখানে এই বাগান। সবজি আর ঘাস। একা হলে জীবনের কথা বড়ো বেশি করে মনে পড়ে। ট্রাক থেকে পড়ে গিয়ে বাগনানের কাঠ-ডিপোর পাশের রাস্তায় পিঠটি তার ভেঙে গিয়েছিল। হাসপাতালের দিনগুলি তখন অসহ্য। তারপর কাশীপুরের মনোহারি দোকানের কাজ। পাউডার দুধ চুরি করে খেত বিভু। একদিন ধরা পড়ে গিয়ে নকুলবাবুর পায়ে হাতে ধরে কোনোরকমে কাজ বাঁচাল, এইরকমই আরো কত কী ঘটেছে তার জীবনে। কত দুর্ঘটনা।

বেলা করে ঘুম ভেঙেছে। পরদিন সকালে আকাশ কাঁসার বাসনের মতোই ঝকঝকে। দাঁত মেজে বিভুর ইচ্ছে করল একটু চা খায়। কিন্তু কাছাকাছি কোনো উপায় আছে বলে মনে হলো না। উনুন ধরিয়ে চা খাওয়ার থেকে না খাওয়াই ভালো। একটা ভাড়া ট্যাকসি এসে দাঁড়াল বাগানের মুখে। নামল ছোটো দত্ত। সঙ্গে একটি মেয়েমানুষ। এই সকালবেলায়। দত্তর বউকে চেনে বিভু। কই সে তো নয়?

তুই নাকি রোজ ওই মাঠের দিকে চলে যাস? ছোটো দত্ত বিভুকে দেখেই জিগ্যেস করল। তারপর সঙ্গের মেয়েটিকে বলল, এই আমার বাগান। আবার বিভুকে,—কি রে উত্তর করিস না কেন?

না, মানে একা একা ভালো না লাগলে লোকগুলির সঙ্গে গল্প করে আসি।

তা যেতে চাস যা। আমি ঘন্টা দুই বাগানে থাকব। দুর থেকে নজর কাজ করে তো? বেগুন পাতায় পোকা আসেনি তো—রোজ সকালে ছাই দিবি গাছের মাথায়। ভুট্টার গাছে দানা এসেছে?

দত্তের সঙ্গে যে মেয়েটি এসেছে তার চোখ কিন্তু সবুজ পৃথিবীর দিকে। দেখে মনে হয় এই ধরনের মেয়েরা কখনোই ভাতের কথা ভাবে না। বরং গোলাপ ফুল খেয়ে থাকে। ভাবুক চোখে চারদিকটা জরিপ করে সে বলল, আহা কী সুন্দর! তোমার কতদিনের চেষ্টায় এই বাগান?

পনেরো বছর, ছোটো দত্ত উত্তর করল। তারপর সিগারেট ধরিয়ে হালকা করে টানতে টানতে বলল, এসো, এদিকটা দেখলে আরো ভালো লাগবে।

মেয়েটি বিভুর দিকে তাকিয়ে দত্তকে বলল, কই, তেমন তো নয়। একেবারে কচি মুখ। কত আর বয়স হবে, আঠারো/উনিশ। মুখ দেখে কে বলবে, ভেতরে ভেতরে বদমায়েসি বুদ্ধি। যাই বলো, তুমি কিন্তু ভুল বুঝেছ···

আরো হজবরজর বকতে বকতে ছোটো দত্তর পেছন পেছন চলে গেল মেয়েটি। বিভু তাকিয়েছিল সেদিকেই। ভুট্টা গাছ বাড়তে বাড়তে এদিকটা নিবিড় প্রাণের মতো ঘন। বিপরীতে, মাঠে লোকজন। সেই লরিবালাকে আর দেখা গেল না। বরং গয়না আর তার খুড়ি যথারীতি এসেছে। গয়না বসে ছিল উবু হয়ে আর বুড়ি তার পুঁটুলে কী সব বাঁধাছাদা করছিল। আড়চোখে দেখে ফেলে গয়না বুকের কাপড় ঠিক করল। যেন ঠিক না করলে পুবজোয়ারি দমকা বাতাসে উড়ে যেত শরীরের সবকিছু, এমন একটা ভাব ছুঁড়ির চোখে চোখে!

একটা বুড়ো-মতো লোক ন্যাকড়া ছেঁড়া কুড়িয়ে কুড়িয়ে বস্তায় ভরছিল। বুড়ির কাছে এসে বলল, পার্ক স্ট্রিটে ট্যাঙ্কারের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে জলছে একটা বাস। তেলভর্তি ট্যাঙ্কার, আহা গো! লোক মরল পাঁচজন।

বুড়ি বলল, ভগবান ভগবান। কোন ধারে ইয়াসিন চাচা?

চাচা উত্তর করল, ব্রিজের পরেই।

দমকল ছুটছে টং টং। শব্দ ভেসে আসে সেদিক থেকেই। বুড়ো ইয়াসিন বিভুর কাছে এসে বিড়ি চাইল। বিভুও খেল। গয়না ভীত বকনাবাছুরের চোখে তাকিয়ে ছিল আগুনের সেই ধোঁয়া বরাবর। বিভু বলল, কী পেলে আজ?

খুড়ি ফাটা বাঁশির মতো বাজে, আর কী, মালের দিকে চোখ আছে সোগো-মারানীর। ঠাট করতে আসে আমার সঙ্গে। পাবে আর কী? বসে বসে পিরিতের গান ছুটাচ্ছে গলায়।

এই বলে বুড়ি পান খেতে গিয়ে বিষম খেল। তারপর বেদম কাশল।

গয়না বলল, যেমন কর্ম তেমনি ফল।

হৈ হৈ করে লোক ছুটল আগুনের দিকে। ইয়াসিন চাচার সঙ্গে চলে গেল খুড়ি। এক মুহূর্তে সারা আকাশ গনগন করে লাল হয়ে উঠল। ভয়ংকর সর্বনাশ নেমে এলো পৃথিবীতে। গয়না বলল, ইস্ আহা!

বিভু সেইদিকেই তাকিয়েছিল। এইবার চোখ টানল মাঠের দিকে। বাগানটিকে এখন বড়ো বেশি নির্জন বলে মনে হয়। শুধু অল্প হাওয়ায় দুলছে গাছের ডাল, পাতা, সর্বস্ব। বিভু বলল, তুমি গেলে না?

তুমি তো পুরুষ মানুষ। এত ভয়? ভেতরে ভেতরে, গয়নার শরীর কিন্তু উচ্ছল হয়ে ওঠে। একা, একটি মুহূর্ত। কাউকে এভাবে দেখতে পারার মধ্যে আলাদা একটা তৃপ্তি আছে বোধ হয়। আর সে তৃপ্তি শুধু গয়না নয়, বিভু নয়, যে কোনো রক্তমাংসের জীবনে একবার না একবার আসেই। কোথায় কোন দেশ ধ্বংস হয়ে গেল তখন সেই সংবাদ চাপা পড়ে যায়। পৃথিবীর আগুন পিছু হটে শরীরের আগুনের কাছে। দেহব্রহ্মাণ্ডের হলকা ধ্বংস করে শৌখিন তন্তুলতাগুলি। মানবিক এই আগুনটি কিন্তু শুধু কাম নয়, মন বা আরো দুর্বোধ্য কোনো কিছু বটে। বিভু বা গয়না এতসত জানে না। শুধু অদৃশ্য ইঙ্গিতে প্রবাহিনীর মতো অনর্গল কথা বলে যায়।

কী কথা এত বলে ফিসফিস করে, ঠোঁট চেপে, ঠারেঠুরে কিংবা অন্যদিকে তাকিয়ে প্রাণের ইশারায়! মানুষ বা পৃথিবী কোনো কিছুই কি ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে নয়! চোখের পর্দা ছুঁয়ে বয়ে বয়ে যায় কিছুটা হাওয়া, কখনো ঠাণ্ডা, কখনো বা গরম। তবে কি এই হাওয়াটির জন্যই এখানে আসা, এখানে আসে গয়না কিসের খোঁজে? আবর্জনার স্তূপে রাবিশের গাদায় এই গরম হাওয়াটি গয়না খুঁজে পেল কখন? সেই অমীমাংসিত জিজ্ঞাসার পাশে গজিয়ে উঠল তুচ্ছ কথা। বিভু বলল, কাল একটা ফুলদানি পেয়েছিলাম, নেবে?

না। গয়নার সহজ উত্তর, ভাঙা জিনিসটা দিয়ে কী হবে?

না, লোক মরেনি। উড়ো খবর অবশ্যি সাতজনকে মেরে ফেলেছিল। ইয়াসিন চাচা ফিরে এসে বলল, রাখে হরি তো মারে কে? বুড়ি বলল, সবই তোমাদের আল্লার দয়া।

গয়না আর খুড়ি শালপাতার ঠোঙায় ভরে আলুর দম এনেছিল। বিভুর খুব ঝাল লাগল। একটু আড়চোখে গয়নার দিকে তাকাতে যাবে অমনি ছোটো দত্তর

সেই ট্যাকসি গাড়িটা হর্ন মারল। কেঁপে উঠল মাটিটি পর্যন্ত। শোনামাত্র দৌড়ে ওঠে বিভু।

দুপুরে গাছ থেকে তুলে এনে ঢেঁড়স ভাতে দিল সে। আলুসেদ্ধ, ডালসেদ্ধ, ঢেঁড়স মাখা আর গাওয়া ঘি। মন্দ লাগল না খেতে। তবে একটাই কথা, খেতে বসলে নাকে এসে লাগে টেনারি থেকে ভেসে আসা চড়া রাসায়নিক গন্ধ। বিভু চেনে না রাসায়নিক ক্ষার। ভেসে আসা গরুর পচা চামড়ার গন্ধ শুধু নাকে ঢোকে বিষের মতো। কিন্তু হাতে অনন্ত অবসর, গাছপালা দেখতে দেখতে বোধ হয় বিভুর চোখে ঘুম এসে যায়।

এদিকটায় বিকেল নামে ঝরণার মতো সহস্র ধারায়। এই সময়টা বিভুর বড়ো ভালো লাগে। ফুরফুরে হাওয়া ছোটে পৃথিবীতে। তাতে গম, ভুট্টা বা ধানফুলের গুঁড়ো গুঁড়ো রেণু ওড়াওড়ি করে। নেশা জেগে যায়। চায়ের নেশা, পেটে না পড়লে জীবন ব্যর্থ মনে হয়। মাঠের দিকে চোখ চলে গেলে মাঠ শকুন সব একাকার হয়ে আছে। সাদা ছোটোবড়ো রঙবেরঙের প্রাইভেট এখন শুধু সি সি করে ছুটতে থাকে ইস্টার্ন বাইপাস ধরে, ভেতরে বসে আছে গোলাপসুন্দর-গোলাপসুন্দরী।

দুদিন পরে আবার সেই লরিবালার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল বিভুর। লরি খালি করে খৈনি বানাচ্ছিল লোকটা হাত থাবড়ে থাবড়ে। সেই হাতে মৃত চুন সাদা হয়ে আছে। মাথার ঝাঁকড়া চুলে তার রাজ্যের ময়লা। মুখে কিন্তু খুশি খুশি ভাব। বিভুর কাছে এসে বলে, কি হে বাই? খৈনি এগিয়ে দিয়ে বলে, একদম জর্দা মাফিক, লক্ষ্ণৌবালা।

আজকের রাবিশে তেমন বাজে গন্ধ নেই। শুধু নোংরা শুকনো খড়কুটো। লোকজন শুধু ঘেঁটে ঘেঁটে সারা হচ্ছে। বোধ হয় কোথাও কিছু নেই। বিভুরও মনে টান লেগেছে। বুড়ি আর গয়না কয়েকদিন হলো আসছে না। লরিবালা বলল, দিমাক আচ্ছা নেই? কেয়া?

মনের দুর্বল কথাগুলি অন্যের কাছে বলে কী লাভ? বিভু বলল, শরীর খারাব।

ইয়াসিন চাচার সঙ্গে আজ এসেছে একটি নতুন ছেলে। রাবিশ উটকে সে পেয়েছে একটি ঝকঝকে ছুরি আর পেট চ্যাপ্টা মদের বোতল। ইয়াসিন চাচা খানিকটা গলায় ঢেলে তীব্র জ্বালায় বলে উঠল, আ!

আজ গয়না আসেনি। টিয়া আর পারেশ ঝোলা ভর্তি করে হাবিজাবি কুড়িয়েছে। পারেশের বাপ ভাঙা কাচ কুড়িয়েছে একটা ঝুড়িতে। বাঁকা-তেবড়া

টিন ভাঙা, তোরঙ্গ কুড়িয়েছে। পার্কসার্কাসের ফুটে এগুলেই কেজি দরে কিনে নেয় কারবারিরা। কত লোকই ছোটখাটো কত কিছু পেয়েছে। জনে জনে জিজ্ঞাসাবাদ করতে যাও, তারা বলবে, না ভাই।

দামি বস্তু কি আর আছে? মানুষজন আজকাল সেয়ানা হয়ে উঠেছে। আগে আগে সোনাদানা মিলত বৈকি! দিন বিলকুল পাল্টে যাচ্ছে। কে কি পায় সে আর সব কি খুলে বলতে চায়! তল-কাপড়ে করে সটান ঘরের দিকে চলে যাবে। আমার ভাগ্যটাই ভাই খারাপ। এইসব বলে আবার হাতের শিকটি দিয়ে কুটো-রাবিশ উটকাতে থাকে। লটারির মতো, যদি কিছু মিলে যায়। অন্বেষণে মানুষের চোখজোড়া যে কী ভীষণ তীক্ষ্ণ! বিভুর অবাক লাগে।

আজ আর ছোটো দত্ত এলো না। বুড়ি বা গয়না কেউ না। কী অসহ্য একাকিত্বে যে বিভুর সময়টি এগিয়ে যাচ্ছে তা সে ছাড়া আর কে বুঝবে। মা, বাপহীন পৃথিবীতে যারা একা তারা অনাত্মীয় মানুষের কাছে অনেক কিছু আশা করে বসে থাকে। বিশেষত গয়না; মেয়েটা কি তবে সত্যিই ধান্দাবাজ! সবাই ঠকিয়ে যাবে বিভুকে সরল পেয়ে? সবই কি চোখের ভুল! সেদিন যে পঁচিশ টাকা চেয়ে নিল ভিখারির মতো, মেয়েটার লজ্জা করল না! ছি ছি হায়া পিত্তি নেই। সত্যি তো, পুরুষমাত্রই ভেড়ার পাল।

হঠাৎ কী করে যে সর্দি-জ্বর হলো বিভু তা জানে না। জ্বরের দিনগুলিতে ভাঙা পিঠের সেই মরা ব্যথাটা আবার যে জেগে উঠল। বিকেল বেলায় সে বসে ছিল মুক্ত আকাশের তলায়। ধরেই নিয়েছে কেউ আসবে না। কেউ যে নেই পৃথিবীতে। চব্বিশ থেকে চৌষট্টি এভাবেই বছর কেটে যাবে।

ছোটো দত্তর ছেলে ননী বড়ো হয়ে কে জানে বোধ হয় বাপের মতোই শয়তান হবে। বেগুন গাছ থেকে একটা পোকা নেমে আসছে মাটিতে, বিভুর চোখ সেই দিকে। ইস্! কী হিলহিলে পোকা রে! এমন সময় গয়না চলে আসে সটান বিভুর নাকের ডগায়। কী হলো, কেমন আছো?

এতদিন কোথায় ছিলে?

খুড়ির অসুখ, কার সঙ্গে আসব শুনি। বাবু তো একা ছাড়তে চায় না। তাছাড়া লোকের মুখে কানাকানি কত কথা গিয়ে পৌঁছেচে সংসারের কানে। আর আমাকে আসতে দেবে না বলেচে। টুনির ঘরে যাচ্চি বলে হুট করে চলে আসা।

এই বলে গয়না শর্টকাট হাঁটা রাস্তাটার দিকে তাকাল। বুক উঠছে নামছে উজানভাঁটায়। শরীরে হাঁফ, বুঝিবা দৌড়তে দৌড়তে এসেছে। গয়নাদের পাড়া

থেকে শর্টকাটে আসতে চাইলে ধরতে হবে ওই খুয়ো পথ। নইলে বাইপাসের ওপর দিয়ে পাক্কা একটি ঘণ্টার রাস্তা।

বাগান ছেড়ে হাঁটতে হাঁটতে ওরা মাঠের দিকে এগিয়ে এলো। রাবিশ আসছে লরির পিঠে। এখন কিন্তু তেমন লোকজন নেই। বিকালের পড়ন্ত আলোয় চারদিক সুনসান। ছাপা শাড়ি পরেছে গয়না, আজ একটুখানি যেন ঝকঝকে মনে হয়। বিভু সব কথা শুনে বলল, পালিয়ে এস বাড়ি থেকে।

তারপর খাওয়াবে কে ?

কেন, আমি।

ক'টাকা পাও শুনি, আর এসব শুনলে মালিক যদি তোমাকে ছাঁটিয়ে দেয়—

মাঠে দুর্গন্ধময় রাবিশ পড়ে আছে ডাঁই ডাঁই। তারই হাওয়া কেটে বিভু আর গয়না এগোচ্ছে। স্বপ্নের কথা ভাবছে, বলছে একের পর এক সাজিয়ে। যেন সংসারধর্ম এতই সহজ। চাইলেই স্বর্গ এসে যায় হাতের মুঠোয়।

একটা উঁচু টিলার ওপর দুজন বসেছে পাশাপাশি। শায়া-শাড়ি একটুখানি উঠে এলে গয়নার রোমশ শ্যামলা রঙের পা দেখা যায়। বিভু কিন্তু এখন তা দেখছে না। বরং ভাবছে কীভাবে একটা উপায় করা যায়।

আকাশ থেকে একটা শকুন নেমে আসে মাঠে। তারপর রাবিশ থেকে কী একটা খুঁটে ঠোঁটে ধরে আবার উড়ে যায় আকাশে। গয়না বলে, কী বলত, চকচক করছে—

তাই তো, শকুনটা—

যাও যাও, পিছে পিছে যাও। শকুন নয় চিল।

চিলটাকে তাড়া করে বিভু। উপরে ক্রমশ নীল আকাশের দিকে উড়ে যায় সে—তার ছায়া মাটিতে। সেই ছায়ায় ছায়ায় বিভুর প্রতিযোগিতা। একটা চিল, দুটো তিনটে চিল। মুখ থেকে জিনিসটা মাটিতে এসে পড়ে। আর সঙ্গে সঙ্গে নাকে ঢুকে যায় হুট করে একঝাঁক দুর্গন্ধ। বিভু দেখতে পায়, পচা একটা ইঁদুর। লেজের দিকটা ধ্বস্ত,—শরীর খুঁটেছে ভয়ানক সেই আক্রমণ। পচা আঁশটে গন্ধে যেন শরীরের প্রেমটি পর্যন্ত নষ্ট হয়ে যায় বিভুর।

ততক্ষণে গয়না এসে দাঁড়িয়েছে পাশে। একেই অসুস্থ শরীর, তাতে দৌড়-ঝাঁপ। বিভু বিরক্তিতে বলে, রাবিশের জঞ্জালে পচা ইঁদুর ছাড়া আর কী-ই-বা থাকতে পারে—

গয়না বলে, খুব কষ্ট হলো ?

এই মেয়েটার মুখের দিকে সরাসরি তাকিয়ে বিভুর কী জানি কেমন নরম লাগল। আস্তে করে চোখ উপরে তুলে বলল, না— । আর তাকিয়ে থাকল গয়নার দিকে।

পরদিন সকালে ছোটো দত্ত এলো বাগানে, সঙ্গে সেই মেয়েমানুষটি। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল কপিগাছগুলি। অসময়ের ফুল তেমন বড়ো হতে পায়নি। ছোটো দত্ত বলল, শালা চারাগুলো যখন দিয়ে গেল তখনই মনে হয়েছিল টিরা বীজের চারা। এ বছর শুধু লোকসান। তবে ভুট্টা গাছে ভালো দানা এসেছে। বিভুকে সামনে পেয়ে ঝাড়ল এক হাত, হ্যাঁ রে—লোকজন কী বলচে—কী?

কে?

তুই নাকি কার সঙ্গে পিরিত করছিস, ওসব পিরিত-টিরিত এখানে থেকে চলবে না—

বিভু কোনো উত্তর দিল না। শুধু শুনে গেল কথার ঝাঁঝ। পৃথিবীতে যাদের টাকা বেশি তাদের কথায় এই রকমের একটা তীব্র ঝাঁঝ থাকে বটে। চটে না গিয়ে তাকে কৌশলে হজম করে নেওয়াই ভালো।

ছোটো দত্ত এদিক-ওদিক ঘুরে ফিরে দেখল, বাগানটি কোথায় কেমন আছে। সব ঠিকঠাক তো? তারপর একটা লম্বা হাই তুলল হাত পা ছড়িয়ে, যেন সারারাত বেচারি জেগে কাটিয়েছে। বলল, যাবি তো যা, একটু ঘুরে আয়। গেল পরশু একটি খোকা ওই রাবিশের গাদায় বাক্সবন্দী সোনার বাট পেয়েছে, এই বলে মেয়েটির দিকে ঠোঁট চেপে হাসল ছোটো দত্ত!

বিভু কিন্তু অত বোকা নয়। তবে এক্ষেত্রে বোকামি বা বুদ্ধির কৌশল খাটে না। হাঁটতে হাঁটতে যখন মাঠে এসে পৌঁছল তখন মাথার উপরে ঝুনো রোদ বুনো হয়ে উঠেছে। এই দুদিন কিন্তু বৃষ্টি নেই। রাবিশ থেকে সরে যাচ্ছে সেই পচা গন্ধটা। খুড়ি আর গয়না তো নেই, এমনকি ইয়াসিন চাচাকেও আজকে দেখা যাচ্ছে না। বরং অনেকগুলি নতুন মুখ শিক দিয়ে রাবিশের ডাঁই উটকাচ্ছে। এবং খুট খুট করে কী যেন কুড়িয়ে যে যার ঝোলায় রাখছে ভরে। কী আর কুড়োবে, সব সময় দামি বস্তু পাবে কোথায়? বরং ছোটোখাটো যা কিছু পায়, আদর করে তাই কুড়িয়ে রাখে। তুমি যাকে রাখো, সেই তোমাকে রাখবে একদিন।

সেই ট্রাকের তলায় শুয়ে গ্যারেজ ম্যানের মেরামতির কাজ, আর এই নির্জনে বাগান পাহারার কাজ—দুটি কেমন ভিন্ন। এদের কিছুতেই আলাদা করতে পারে না বিভু। মানুষকে কত যে অবস্থার মধ্যে যেতে হয়!

ঘুমিয়ে পড়েছিল সে। অলস মানুষের চোখে তাড়াতাড়ি ঘুম আসে। ক্লান্ত শরীর এলিয়ে যায় বিছানায়। কিসের খুট শব্দে চোখ খুলে দেখে, ল্যাম্পের আলোয় গয়নার ডিমেল মুখটা কেমন যেন জ্বলে ওঠে। এত রাত্রে? কী করে এলে?

বাবা হাওড়া গেছে কাকার বাড়ি। বাকি সবাই ঘুমাচ্ছে। আসতে মন করল, চলে এলাম।

বিভুর একেবারে পাশটিতে এসে বসল গয়না। দুই হাতে চুল টেনে দিচ্ছিল ঠিক বউয়ের মতো। মেয়েটাকে সেদিন দেখে তো এতটা ভাবেনি বিভু। ছুটে বেড়ানো চপল মানুষকেও হঠাৎ হঠাৎ মানুষের খুব নতুন বলে মনে হয়। গয়না বলল, এই জানো, ইয়াসিন চাচা আজ দুপুরে মরেচে।

সে আবার কী?

ও মা শোননি, ভেদবমি হচ্ছিল গত রাত থেকে। আজ দুপুরের দিকে সব শেষ হয়ে গেল।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল গয়না। তীক্ষ্ণ তীরের মতো সেই শ্বাসটি যেন শরীর থেকে নেমে সটান মাটিতে গিয়ে ঢুকে গেল।

বিভু বলল, বাদ দাও ওসব হাবিজাবি কথা। এই বলে কাছে টেনে নিল।

একটিই মাত্র জানালা। তার বাইরে শাদা জ্যোৎস্নায় মাখামাখি পৃথিবীকে অপরূপ মনে হলো। দরমার দেওয়াল দুটি মানুষের শরীরের তাপে যেন-বা ঝলসায়, যেন-বা মৃদু চালে টলছিল। কী একটা কথার উত্তরে গয়না বলল, যার চাল নেই চুলা নেই তার সঙ্গে ঘর থেকে বিয়ে দেবে কেনঅ?

অভিযোগটি মিথ্যা নয়। এখনো পুরুষ যাকে বলে তা হয়ে উঠতে কিছুটা সময় লগবে বিভুর।

দমকা হাওয়া এলো মাঠের দিক থেকে। একঝাঁক নোংরা গন্ধ দুজনেরই নাকে ঢুকে ভুল-ভুল করে দিল। কে কাকে পায় পৃথিবীতে! কে কার একার হয়ে থাকে চিরদিনের। সম্পত্তি তারও তো বেহাত আছে। তবু এই মুহূর্তে যে দুটি মানুষ নিবিড় হয়েছে, তারা পেয়ে যাচ্ছে পৃথিবীর সবকিছু, তাইবা কি কম মূল্যবান! ওই বোটকা গন্ধ, রাবিশের ডাঁইয়ের আড়ালেই তো দুটি মানুষ এতকাল চাপা পড়ে ছিল। নোংরা, ময়লা, ফেলে দেওয়া জীবনের মধ্যেই অনাবিষ্কৃত ছিল দুটি জীবন্ত মানুষ। আজ কে তাদের জাগিয়ে দিল! গভীর রাতে নোংরা মাঠটি শুধু একা খাঁ-খাঁ করে। ঘরের মধ্যে দুর্গন্ধ আর সুগন্ধ। সকালে কী হবে তার কথা না ভেবে শুধু কাছাকাছি আসা।

ঝড় আছে মাথার ওপর, আর প্রাণ আছে হাতের মুঠোয়। বিভু বলল, এতদিন তুমি কোথায় ছিলে?

নোংরা শাড়ির আড়ালে থেকে পাকা সোনার মতো ঠন ঠন করে বেজে ওঠে গয়না, হেথায়··· ।

পৃথিবীর সেই আদিম, অনন্ত, শূন্য, অন্ধকার, নিরস্ত্র একটি মাঠে এখন শুধু ক্ষেত্রধ্বনি, সন সন করে সৈনিক হাওয়া বয়ে যায়।

গালগপ্প অথবা অন্ধতার বিরুদ্ধে

এক অলৌকিক ভোরবেলায় ঘুম থেকে উঠে নাগকেশর দেখল তাদের উঠোনে বসানো আছে একটি চমৎকার ফুটফুটে কার্তিক ঠাকুর। গল্পের শুরু দেখেই বোঝা যায় কোথায় গিয়ে পৌঁছবে পরিশেষে। নতুন কোনো কাহিনী নেই নাগকেশরের। জানা গল্প। চেহারা দেখেই যে-কেউ বলে দিতে পারে তার অতীত উপাখ্যান, জীবন-বৃত্তান্ত। কিংবা আর কি কি ঘটতে পারে সেই সম্ভাবনার আগামী ইতিহাসটি। তাই ধরাবাঁধা ছকে, প্রথম ছত্রেই ফুরিয়ে যায় নাগকেশরের গল্প। অর্থাৎ তার বউ, এ তাবৎকালে যার গর্ভে সন্তান আসেনি—এই কার্তিক ঠাকুরের মহিমায় সে সন্তানবতী হয়। ধুমধাম করে পুজো পাওয়ায় পর কার্তিক ঠাকুর আত্মাচালান হয়ে একেবারে নাগকেশরের বউয়ের গর্ভে। তারপরে নতুন রূপে আত্মপ্রকাশ—একেবারে নাগকেশরের চারাটি হয়ে। এইবার সেই চারা যত বাড়তে থাকবে নাগকেশর তত ইতিহাস হয়ে উঠতে থাকবে। জন্ম ও মৃত্যু এই দুইয়ের মাঝে যে বাস করে সেই জীবনবাবু আস্তে-ধীরে বিদায় নেবেন। ব্যস, ফুরিয়ে গেল নাগকেশরের কাহিনী।

এই গল্প গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে আছে। অপুত্রক অসুখী সংসারে প্রতিবেশীরা মাঝরাতে কার্তিক ঠাকুর রেখে আসে ভালোবেসে। সকালবেলায় ঘরে তুলে নিয়ে ঠিক মনে পুজো করতে পারলেই সন্তান।—ঠাকুর-মহিমা এভাবে দিক-দিগন্তে বাতাসের মতো ছড়িয়ে যায়। লোকে ধন্য ধন্য করে। এইমতো দেবের নামে ছেলের নাম রাখা হলো কার্তিক।

তখন নাগকেশর তার বউয়ের দিকে তাকিয়ে অল্প হাসে, বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা। ধরা যাক তার নাম মিনতি। অর্থাৎ যার চোখে সারাক্ষণই অনুরোধ ঝরে···।

মনের দুঃখে নাগকেশর একটি গাছের ছায়া বেছে নিয়ে তার নিচে গিয়ে বসে, কিংবা নিজের ছায়ায়।

পৃথিবীতে মানুষের ভেতরকার সব কাহিনী কি লোকমুখে ফিরতে পারে, নাকি সব দুঃখ ঢেলে সাজানো যায়, হদিস পাওয়া যায় তার। তবে জীবন দিয়ে নাগকেশর একটা ব্যাপার বুঝেছে যে, কেউ কেউ মুখে কুলুপ এঁটে থাকে বলে জগতে এত অলৌকিক ঘটনা ঘটে চলেছে। ঘটতে পারে। নিজের ছায়ায় বসে বসে এভাবেই নাগকেশরের বয়স বেড়ে যায়। তবু গায়ের জোরে জমি আঁকড়ে রাখার মতো বেঁচে থাকে সে। ঘন ঘন প্রাণ পায়। এবং অবশেষে মরে যায়। কিন্তু মৃত্যুর অব্যবহিত আগে সে এক অভিনব গল্পের সূত্র হয়ে ওঠে। তখন মৃত্যুযন্ত্রণায় জীর্ণ তার মুখমণ্ডল। চোখ ঠিকরে ছিটকে বাইরে বেরিয়ে আসতে চাইছে। সে তার প্রিয় বউ মিনতিকে কাছে ডাকল। মিনতি সজল চোখে কাছে এলে নাগকেশর বলল, আমার সময় ঘনিয়ে আসছে। আমি চলে যাচ্ছি। কিন্তু একটা কথা—সংসারে থাকাকালে তুমি যা আবদার করেছ, রেখেছি। এমনকি কার্তিক যে আমার ছেলে নয় একথা জেনেও কোনোদিন তোমার সম্মানে হাত দিইনি। এবার আমার একটি আবদার আছে, মৃত্যুর পর আমার মুখাগ্নি যেন ওই ছেলে না করে। যদি আমার কথার অন্যথা করে ওই কার্তিক মুখাগ্নি করতে যায় তবে আমি কিন্তু পুড়বো না—যত আগুন লাগবে গায়ে আমি ধরব বিশাল গাছের চেহারা। তাকে কেউ পুড়িয়ে শেষ করতে পারবে না। সুতরাং সাবধান। জানোই তো অলৌকিক সাধনের ক্ষমতা রাখি, জীবনের দশটি বছর অগমপন্থী সাধুদের আখড়ায় কাটিয়েছি। অতএব সাবধান। আমার মুখাগ্নি করতে পারে একমাত্র আমার নিজের সন্তানই—

এই কটি কথা বলে, বউকে তার প্রত্যুত্তরের সুযোগ না দিয়েই বহুকালের পুরানো ত্রিকালদর্শী বুড়ো নাগকেশর প্রাণত্যাগ করল। তখন সকালের উষা কার্তিক ঠাকুরের মুখের আভার মতোই রঙ ধারণ করে নাগকেশরের ঘুমন্ত চারাটির ওপর এসে পড়ল। সে জেগে উঠে দেখল তার বাপ মরে গেছে।

তা গেছে যাক, পৃথিবীতে কেউই চিরকাল বাঁচে না। কিন্তু একবার কেউ মরলে আত্মীয়স্বজন শব্দ করে কাঁদে।

যথানিয়মে সবাই কাঁদল এবং থামল।

এইবার তো একটা ভালো নিম গাছ দেখে সৎকার করতে হবে। গাছ দেখা

লো। ডালের পর ডাল নাবানো হলো কুড়ুলের ঘায়ে। চুলা কাটা হলো শ্মশানতলায়। ঠিক এমন সময় খোকার মা মিনতি বলল আসল কথাটি :

সাপ কাটিতে মরেছে খোকার বাপ।

কি সাপ?

বাস্তু সাপ। মা মনসার বাহন—

তবে কি হবে?

প্রায়শ্চিত্তি না করে মড়া ঘরের বাইরে আনলে বিপদ, তখন আরো ছ' পোয়া পাপ বাড়বে—

এখন হবে কি?

বিধান চাই। নজরগঞ্জে লোক পাঠিয়ে ভৈরব তান্ত্রিক আর ভৈরবীকে আনাতে হবে। তাঁরা গুণে যে বিধান বলবে—নাকে খত দিয়ে তাই মানতে হবে গেরস্থকে—

লোক ছুটলো নজরগঞ্জ। চার-পাঁচ গ্রাম পেরিয়ে একেবারে হুগলী জেলার কাছে। স্তব্ধ হয়ে রইল ঘর। চৌদিক। একটা কাঁচা ঘোলা জলের রঙে কোরা ধুতি দিয়ে বুড়োর আপাদমস্তক ঢেকে বিলাপ শুরু করে দেয় মিনতি।

সত্যি কিছু কিছু অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী ছিল এই নাগকেশর। ভূতবিদ্যা, মারণ, উচাটন, বশীকরণ জানত। শিখেছিল সেই কাঁইা কাঁইা মুলুকে ঘুরে বেড়িয়ে। লোকে কানাঘুষো বলে, বশীকরণ না জানলে ওই মেয়ে মিনতিকে বিয়ে করল কি করে। এই ঘাটের মড়াকে কেউ স্বেচ্ছায় গায়ে চাপাবে? পর পর তিনটে বউ মারা যাবার পর নাগকেশর চার নম্বর হিসাবে মিনতিকে বিয়ে করেছিল। সে অনেক জল ঘোলা করে তবে অতলের মিষ্টি রুইমাছটিকে ধরতে পেরেছিল নাগকেশর—সেসব গল্প এখন থাক। এখন যে গিঁটে পড়েছ বাঁধা তাকে আগে খোলো।

কার্তিক এখন ১৮ বছরের জোয়ান ছোকরা। তার সামনে যদি মান খোয়া যায়! চোখ মেলে যেদিকে তাকাতে যায় মিনতি দেখতে পায় একটি চিতার চেহারা। আগুন লাগছে কি লাগছে না—শ' দেহ তালগাছের মতো সামনে পেছনে বেড়ে যায়! বাড়তেই থাকে। হা ভগবান, এখন উপায় কি হবে।

মিনতি কপালে হাত চাপড়ে চাপড়ে কাঁদতে থাকে। তা দেখে লোকে বলে, তা কাঁদবে বৈকি—বুড়ো হোক থুড়ো হোক সে তো স্বামী নাকি? মেয়েমানুষের এই জীবন পরজন্মের দেবতা। কেউ কেউ ছড়া কেটে কবিতা বলল,—পতীর পুণ্যে সতীর পুণ্য, নহিলে খরচ বাড়ে।

কার্তিক এসে মাকে শুধায়, বাস্তু সাপ তো আমাদের নেই মা, তুমি কি করে বললে—

তুই চুপ মার বাপ। জানিস কতটুকু ?

দেখিনি তো কখনো—

বাস্তু সাপ কি আর আমার মতো অভাগী যে সব সময় তোদের চোখের সামনে থাকবে, হাড় জ্বালাবে। সে হলো মা মনসা সাক্ষাৎ, সব সময় তার দেখা পায় কে ?

সব মায়ের খেলা ?

হ্যাঁ রে মুরুক্ষু।

মনের কথা কাউকে খুলে বলতে পারে না মিনতি। ভয়ে বুক ছাতি সব দপদপায়। সে জানত তার স্বামীকে। লোকের কাছেই সে শুনেছে বাড়ির পাশে এই বিশাল অশ্বত্থ গাছটা নাকি ছিল না। বীরভূম জেলার পানাগড় (!) জঙ্গল থেকে নাকি রাতারাতি চালান করে এনেছিল তার স্বামী ওই নাগকেশরই। মাঝে মাঝে সে নাকি মৃতদেহর ওপর হাত বুলিয়ে ঝাড়ফুঁক মেরে প্রাণ ফিরিয়ে এনেছিল দু'-তিনবার। দুর্বার ঝড়ের মাঝে হাত তুলে খবরদার জানালে ঝড় থেমে যেত অবলীলায়। অমাবস্যার রাতে নাকি মা কালী তার কথায় শিবের বুক থেকে নেমে এসে মাটিতে নৃত্য করত।

সত্যি, কেন যে সে পরপুরুষ দিয়ে বাচ্চা করাতে গিয়েছিল, সেই মা হওয়ার এখন মুখে আগুন।

এই সব সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে মিনতি দেখল দুপুর পড়ে গেছে। আর এক ঘণ্টা বেলা আছে। তারপরেই বাসি মড়া। তা বাসি হোক—বামুন ডেকে না হয় লুচিমিষ্টি খাইয়ে দেবে। এখন তান্ত্রিক মা-বাবা এসে গেলে বাঁচা যায়।

রূপকথার চেহারা ধারণ করে ভৈরব ভৈরবী এসে হাজির হলো।

কেঁদে পায়ে লুটিয়ে পড়ল মিনতি—শরীরে যেটুকু যৌবনের ছিটেফোঁটা ছিল তার গায়ে বাঁয়ে ধুলো লেগে গেল। তা যাক, এখন এই পাপ থেকে উদ্ধার পেলে পরে দুধ ঘি খেয়ে, সালসা-চ্যবনপ্রাশ খেয়ে ফের যৌবন ফিরিয়ে নেওয়া যাবে।

বউয়ের এত দুঃখ দেখে ভৈরব ভৈরবী তাকে ঘরের ভেতর নিয়ে গিয়ে ভেতর থেকে দরজার খিল আটকে দিল। আগল আঁটা এই ঘরেই নাগকেশরের মৃতদেহ শোয়ানো আছে একটি ফুলকাটা মাদুরে। আহা কি চেহারা ছিল—

এইবার ভৈরবী কালীর নাম মুখে করে যা যা ঘটেছিল বলো তো বউমা ?

একটি কথাও না লুকিয়ে ভগবানের কাছে স্বীকার কর। তিনি হলেন ভক্তের ভগবান—

এই দুনিয়ায় কে না পাপ করে—সবাই করে। কিন্তু সেই পাপের কি আর ক্ষমা নেই?

পাপীকে নয়, মা দূর-ছি করেন পাপকে—কি হলো খুলে বলো মা—

মা তুই খুলে বল—

এই এক হাতে ছুঁয়ে থাক নাগকেশরের চেহারা। তোর স্বামীর দেহ। অন্য হাতে মায়ের পায়ের এই রক্তজবা—

এবার বল। গড়গড়িয়ে বলে যা—

তুই আর মা ছাড়া আর কে জানবে! ভয় কিসের রে তোর—জগদম্বা মানেই হলো—পাপ ভাবলেই পাপ, শান্তিজল পড়লেই সব পাপ তাপ গলে জল হবে রে—

বল এবার। মন খুলে বল দি'মা—

ভৈরব ভৈরবীর উপর্যুপরি জেরার মুখে পড়ে মিনতি বউ তার গল্পের গোটা কাহিনীটিই খুলে বলল। ঘরে ছিল দুটি জানলা, আগে উঠে গিয়ে বন্ধ করে এল। তারপর বলল সব কথা।

এই তো মা, পাপ তো তোরই। স্বামী থাকতে পরপুরুষকে দিয়ে কেউ পেট করায়?

এ তো মহাপাপ!

পারেই তো নাগকেশর, কেমন লোক ছিল তা তো আর কেউ না জানুক আমি জানি। আমরা দুজনে গুরুভাই। তোমার মনে নাই ভৈরবী—সেই যে সেবার—উফ্ কি ক্ষমতা! পারেই তো, তাল গাছের মতো নিজেকে বাড়িয়ে দিলে তখন ভূ-ভারতের সব কাঠ তার ওপর চাপিয়েও কোনো সুরাহা হবে না।

মিনতির বুক আইঢাই করে। হাতজোড় করে সে বলে, তবে কি হবে বাবা?

পাক্কা দশটা হাজার টাকা লাগবে। পারো জমি বন্দক দাও, গয়না বেচ—যা পার করো। ওই মরা নাগকেশরকে আবার পূজা করে শুদ্ধ করতে হবে। ওই টাকা দক্ষিণাবাবদ দিতে হবে—লাগবে মায়ের মন্দির গড়ার কাজে। এবার ভাবো তো মা, কি করবে তুমি—

মিনতি কাঁদো কাঁদো স্বরে বলে, বাবা এতগুলি টাকা। না হয় সর্বস্ব বিক্রি

করে জোগাড় করলাম। কিন্তু মরার সময় যে বলে গেছে নিজের ছেলের হাতের আগুন ছাড়া···। নিজের ছেলেটি এখন আমি পাবো কোথা? লোকের সামনে মুখ দেখাই কি করে। উপায় একটা—

টাকাটা জোগাড় কর আগে।

কিন্তু—

আরে মা—পুত্র হলো গিয়া দুই রকমের। জন্ম সূত্রের, আর পালন সূত্রের। জন্ম সূত্রে না হোক পালন সূত্রে তো ওই কার্তিকই হলো তার ছেলে, নাকি?

মিনতি বলল, তা বটে—

তবে, এত ভয়ের কি আছে? আমরা তো আছি, এসে পৌঁছেছি, কি কারণে—না তুমি নাগকেশরের বউ। অবলা মেয়েছেলে—বিপদে পড়েছ। এখন যাও, টাকা জোগাড় করো—

গয়নাগাটি, ঘটিবাটি, গোরুছাগল যা ছিল, বিক্রি করে টাকার জোগাড় হলো। টাকার জোগাড় হলো জমি বন্দক দিয়ে। মানুষের বিপদে মানুষ গভীর রাতেও যে সাড়া দেয়—এই জন্যই তো বলেছে জীবশ্রেষ্ঠ!

নাগকেশরের দেহটিকে ভৈরব আর ভৈরবীমাতা আরেকবার পুজো করে বললেন, যাও এবার চিতায় তোল। আর আমরা দুজন থাকি এই ঘরে। বন্ধ করে দিলাম দরজা। মরা দেহ পুড়তে থাকুক—যত পুড়বে, ভেতরে বসে পুজো করব আমরা দুটিতে। ধুনি জ্বালব, হোম করব, দেখি পাপ কোথায় থাকে। তবে হ্যাঁ, কেউ যেন এসে আমাদের পুজোয় ব্যাঘাত না ঘটায়।

মাঝরাতে চিতায় তোলা হলো নাগকেশরকে। মিনতি তাকিয়ে দেখছে ছেলে কার্তিক আগুনের নুড়ো হাতে সাতবার প্রদক্ষিণ করছে। ভয় তবু যায় না। মাছের কাঁটার মতো কিছু একটা রক্তের গভীরে থেকে খচমচ করে। যদি সব পূজাআর্চা, প্রায়শ্চিত্তি ব্যর্থ করে দিয়ে দেহটা তালগাছের মতো বাড়তেই থাকে! ভাবতে পারে না মিনতি বউ। আগুন লাগার সঙ্গে সঙ্গে চোখে হাত চাপা দিয়ে সে বলে ওঠে, জয় মা ভৈরবী।

কাঁচা কাঠে আগুন ধরতেও তো সময় লাগে, অমনি খটকা লাগে মিনতির মনে। কিন্তু কিছুক্ষণ ছটফট করার পর দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে চিতা। বার বার কপালে হাত ঠেকায় মিনতি বউ আর তাকায় নাগকেশরের চারা কার্তিকের দিকে—

হ্যাঁ, সর্বস্বান্ত হয়ে ব্যাটা বাপকে পোড়াচ্ছে। যখন আগুন দাউ দাউ জ্বলছে,

নাগকেশরের বউ মিনতি ডাকছে সর্বশক্তিমান ঠাকুরকে—ঠিক তখন নাগকেশরেরই শোবার ঘরে বন্ধ দরজার ভেতরে ভৈরব-ভৈরবী হাসাহাসি করছে। মদ ভাগাভাগি করে খাচ্ছে।

খাচ্ছে আর মন দিয়ে গুনে গুনে দুটি অংশে ভাগ করছে অলৌকিক পথে পাওয়া করকরে নোটগুলিকে। কেননা পৃথিবীর সমস্ত অঙ্কের পিছনে কাজ করে যায় একমাত্র সত্য এই টাকা।

জগৎরহস্য

বিস্মিত চোখে তাকালেন ঠাকুর সর্বানন্দ। এমন সময় একমুঠি রোদ যেন বালকের থুতনি ছুঁয়ে উড়ে গেল। আতপ চালের মতো তীক্ষ্ণ নাক, আতাকোয়া দাঁতে কোনো পাপ নেই···শুধু সাদা সময়ের মহিমা। বালক জানে না কিছু। বটগাছের গোড়ার মাটি খেয়ে নদী চলে গেছে কেশপুর, দাসপুর, নন্দনপুর। বৃক্ষের নিম্নস্থানে হাঁ ওঠা সেই পাঁজরের ওপর বসে—পা দোলাচ্ছিল বালক।···সর্বানন্দ···দেখলেন দুধের বাচ্চা—এখনও জ্ঞান হয়নি, যেন ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে হাসছে, ঠোঁট ফোলাচ্ছে—দেয়ালা করছে।

সূর্য অস্ত যাচ্ছে মোরগ ফুলের মতো রক্তাক্ত হয়ে। এখন শীতকাল। নদী মৃতবৎসার মতো চুপ। নিদেন জলে কোনো তেজ নেই, শুধু সংবরণের খেলা।

জলে নামতে গিয়ে চোখ পড়লো সর্বানন্দের। বহুযুগের পরিচিত বন্ধুর মতো বালক চোখ নাচিয়ে হাসছে। রেগে যান সর্বানন্দ। চোট পায়ে এগিয়ে গেলেন—দেবেন এক ধমক।

কিন্তু স্থির, পৃথিবী পারম্পর্যহীন···বালককে দেখেই ঠাকুরের মনে পড়ে গেল এক কাহিনীমালা। কোথায় যেন দেখা হয়েছিল তাদের। ভাবতে ভাবতে সর্বানন্দর স্মৃতি জেগে উঠলো। মনে পড়লো—এই তো মাসখানেক আগে এই বালকটিকেই সঙ্গে নিয়ে আখড়ায় এসেছিল তার মা বাপ।—ঠাকুর, ছেলের আমার মতিভ্রম। পাগল খোকা। হাসে, শুধুই হাসে। কাঁদতে পারে না।

ময়লা কাপড় ছিল সেই আধবুড়ি মেয়েটির গায়ে। একদা যৌবন যেন হারিয়ে শূন্য হয়ে গেছে। বাপটা হাঁটুর ওপর আট হাতি কোরা ধুতি পরেছে, পায়ে টায়ারের স্যাণ্ডেল। লাল ধুলো। ফাটাফুটির দাগ। বালক ছিল উলঙ্গ। কোমরে

তিলসাগরি ধানের পাতার মতো লালচে ঘুনসি। পরিত্রাতার চোখ নিয়ে গভীর দৃষ্টিতে সেই বিপন্ন মা-বাপের দিকে তাকিয়েছিলেন ঠাকুর সর্বানন্দ। সকলের দুঃখকে হরণ করে তিনি আনন্দ দান দেন।

তখন শ্মশান আখড়ায় মহাচুল্লি জ্বলছিল—পুড়ছিল এই পৃথিবীর মৃত, অসহায় সর্বস্বান্ত এক মানুষ। সেই চুল্লি থেকে কয়েক হাত দূরে কুশের আসন। মেদিনীপুর জেলার কুশ—বহুজপিত ব্রাহ্মণের পৈতের মতো ময়লা রঙ নিয়ে জন্মায়। সেই শুদ্ধপিঠে বসেছেন সাধু সর্বানন্দ। তাঁর দুই দিকে দু'টি বাঁশের চাঙারিবোনা ঝুড়ি। বিশাল সেই দুই ঝুড়ির একটিতে আছে এক সহস্র ভাঙা ইটের টুকরো। ছোটো ছোটো আলুর মতো, সিঙাড়ার মতো তেকোনা কিংবা একটু লম্বাটে। অন্য ঝুড়িটিতে রুমালের মতো ছোটো ছোটো করে কাটা আছে লালশালু।

মাঝখানে, চুল্লির ওপারে বসেছেন ভৈরবীমাতা দেবী অখিলেশ্বরী। অখিল ভুবন যাঁর দুই হাতের মধ্যে ঘুরে বেড়ায় সেই জগদম্বা। জ্বলন্ত হোমকুণ্ডের মতো চাক্ষুস দেখেন দাহনক্রিয়াটি। হাজার হাজার তাপিত, নিপীড়িত, অসুখী লোক-জনেরা দৌড়ে দৌড়ে আসে সাত গাঁ থেকে। দূর-দূরান্তের বাস-গাড়ি বয়ে আনে মানুষজন। নদীর অববাহিকায় চাষীদের শখের বোরো ধানের দিগন্ত আহ্লাদে বাড়ে। মহাগগনে চিলের কান্না।

যাদের মনোবাসনা পূর্ণ হয়নি তারা কাচা কাপড়ে এসে হাঁটু গেড়ে বসে দেবী অখিলেশ্বরীর কাছে। চুল্লির থেকে মরা কয়লা কলাপাতায় তুলে তাতে যজ্ঞ ঘি ঢেলে পেতলের কুশিতে করে ঘেঁটে নেন জগদম্বা। তারপর ভস্ম চিহ্ন সেই যজ্ঞ বিভূতির ফোঁটা কপালে এঁকে দেন ভৈরবী মা। তখন সেই লোকটি—যে দুরান্ত থেকে রূপকথার মায়ায় সেই সুখের সন্ধানে অপূরিত মনোবাসনাটি বয়ে এনেছে এই নদীর ধারে, ধাম আনন্দপুরে সে গিয়ে দাঁড়ায় ঠাকুর সর্বানন্দের কাছে। লাল চোখ তার বেত ফলের মতো স্নিগ্ধ। কুশল শুধান তিনি। জগতের কুশল। ত্রিলোকের কুশল। মহা মানবসাগরের কুশল। তেমনি সেই পরিচয়হীন মা-বাপ এসে দাঁড়ালো ঠাকুরের সামনে। সঙ্গে বালক ভিখারির ঝুলির মতো আধলম্বা। গোটা সোনাটি।

চোখ তুলে তাকালেন ঠাকুর সর্বানন্দ।

—ঠাকুর ছেলের আমার মতিভ্রম। পাগল খোকা। হাসে শুধুই হাসে। কাঁদতে পারে না—

মা বলছিল কথাগুলি। ভীমরুলের চাকের মতো কালো একটি মোটা মাথা

নিয়ে বাপ দাঁড়িয়েছিল আকাশের নিচে। চোখ নিস্পন্দ। মরা শুকনো হতাশ একটি তালগাছের মতো।

ঠাকুর বালকের থুতনি নেড়ে দিলেন—একটি কচি বাতাবি লেবুর মতো মুখ, ধান ফুল চোখ, স্তনবৃন্তের মতো নাক ঈষৎ চাপা। আর চুলগুলি সিল্কের সুতোর নিয়মে গড়িয়ে গড়িয়ে যায়।

বাহ্‌ মা। খোকাটি তোর বড়ো সুন্দর।

—তারপর দুর্দান্ত বাঘ যেমন বেড়ালের দিকে চিরশত্রুতায় স্থির হয়ে যায় তেমনি স্থির হলেন গুরুদেব। শ্মশানের আগুন তার কপালে দিয়েছে মুক্তাবিন্দু ঘাম। মুহুর্মুহু তারা ভেঙে গলে জল হয়ে পড়ছে যেন হিমালয় থেকে। ঠাকুর এক হাতে ঝুড়ি থেকে তুলে নিলেন একটি ইটের ঢেলা। অন্য হাত বাড়িয়ে আনলেন লালশালুর ন্যাকড়া ছেঁড়াটি। পাটের সুতলি সুতোয় তাতে বাঁধলেন ঢেলা। বালকের হাতে দিয়ে বললেন—যা, ওই গাছটায় বেঁধে দিয়ে আয়।

মা-বাপ বালক তাকিয়ে দেখলো দূরে একটি গাছ ভরদুপুরের রোদটি মাথায় ধরে কেমন একা একা দাঁড়িয়ে আছে। তলায় কালো ছাগল ঘুমোচ্ছে বিশ্রামে। চিকরিকাটা আলপনায় তার পিঠ ভরে আছে—গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে সূর্যদেবের চুমো পড়ে এই কাণ্ড।

বালক হেসে উঠলো। চমকে গেলেন সাধু—চোখ রাঙিয়ে বললেন, যা—। চলে যা।

বালক হাঁটতে শুরু করলো।

আঁচল থেকে খুলে আঠাশটি এক টাকার কাঁচা মুদ্রা মা সাধুর পায়ের কাছে দিতে গেল। সাধু সর্বানন্দ দেখিয়ে দিলেন—টিনের প্রণামী বাক্স।—ওখানে গলিয়ে দাও।

সেই বালকটি, আজ, এই নদীধারে বটগাছের গুঁড়িতে বসে বর্ষারাত্রির নীল ঠাণ্ডা জ্যোৎস্নার মতো চুপ হয়ে আছে। মাঝে মাঝে ঠোঁট তার ঝিলিক দিচ্ছে। চিকন হাসছে। উথলে উথলে উঠছে। সূর্য চলেছে চলন্তা—পশ্চিমে, আবছায়ায় তলিয়ে যাচ্ছে।

ঠাকুর সর্বানন্দর সান্ধ্য বন্দনার সময় এখন। জলে নামতে যাবেন এমন সময় সোল্লাসে বালক হেসে উঠলো। যেন বিদ্রূপ, ঠাট্টা, ইয়ার্কি, চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ছে তার ঠোঁট বেয়ে। কষের মতন। ছেলেটাকে নিয়ে সাধু সর্বানন্দ এই মুহূর্তে যে কী মুসকিলে পড়লেন তা যদি ঈশ্বর জানতো।

সূর্য তলিয়ে গেল মাটির তলায়—মহা অতলে। মন্ত্র পড়ে রইলো নাদ কুণ্ডলীতে।

স্নান আটকে গেল বালকের হাসির ডগায়। সর্বানন্দ এগিয়ে গেলেন গাছের গোড়ায়। বালকের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন—হেসে উঠলি যে?

কাঁচা লঙ্কার গা থেকে ঠিকরে পড়া হালকা সবুজ বালকের গালে, গলায়, নাকের পাটে। হাতে কী একটা ফল—ঠোঁট ঘষছে সে।

দিন ফুরিয়ে যাচ্ছে বুঝতে পেরে প্রাণপণে যত পারছে হাওয়া বাতাসে পাতা নাড়ছে বটগাছ। কেননা ওই বটগাছটির মাথাতেই প্রথম অন্ধকার নামে—তারপর রাত্রি প্রত্যাবর্তন করে পৃথিবীতে। সেই গাছ যেন একটি ছাতার মতন—এখন বালক তলায়।

ঠাকুর আবার বললেন, কি, কথা কানে যাচ্ছে না—খুব যে হেসে উঠলি—

বালক বলল—এসো না—। বসো এখানে, ওই দেখো—।

ঠাকুর সর্বানন্দ চোখ তুলে তাকালেন। নদীর জলে ছমছমানি। আবছা অন্ধকার স্ুঁচের মতো কিংবা সাপের মতো নামছে। নামছে পুঁই সাপের মতো লাফিয়ে লাফিয়ে। জলের ভেতর সাঁ সাঁ করে ঢুকে যাচ্ছে। তবু সেই অস্পষ্ট জলের ভেতর থেকে দেখা যায়। এক ঝাঁক সুখী মৌরলা মাছ জলের এক আঙুল নিচে আলাপনে মেতেছে। ঝাঁক ধরেছে। রুপার নাকছাবির মতো ঝিকঝিকিয়ে উঠছে। বালক যেন সেই মৎস্য পুরাণের দৃশ্যাবলী দেখাতে চাইলো ঠাকুর সর্বানন্দকে।

সাধু একটু ঠাণ্ডা হলেন। বললেন, কী খাচ্ছিস তুই?

—ডালিম—

—ডালিম? —ডালিম কোথায় পেলি এমন দিনে—

—কেন—ওই গাছটায়—

দূরে দেখালো বালক। গাছ উদাস হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। চমকে উঠলেন সাধু। ওই তো সেই গাছ। শক্ত সমর্থ পুরুষ গাছ। যার ডালে-ডালে লোকজনেরা ঢেলা বেঁধে দিয়ে যায়। সাধুর দেওয়া ঢেলা—আঠাশটি টাকা দিয়ে যে ওই গাছের ডালে বেঁধে দিয়ে আসবে তার মনোবাসনা পূর্ণ হবে। এখান থেকেও আবছা আঁধারে স্পষ্ট দেখা যায়। লালশালুতে বাঁধা অগুনতি ঢেলা ঝুলছে গাছটায়। গাছ ধারণ করছে মানুষের দুঃখ, কষ্ট, ইচ্ছার মহিমা।

সাধু চমকে উঠলেন—মিথ্যা কথা, আমার সঙ্গে ইয়ার্কি হচ্ছে। ওটা তো বাঁজা গাছ। ওতে ডালিম ধরে না। ফের যদি মিথ্যে বলিস তবে কিন্তু সাবধান।

এই বলে সাধু সর্বানন্দ ভয়ংকর এক রোষদৃষ্টিতে তাকালেন বালকের দিকে।

যেন চড়ুই পাখি উড়লো এমন করে হেসে উঠলো বালক। ভড়কে গেলেন সাধু। বালক বললো, যাও না দেখে এসো। ডালিম ফলে কি ফলে না?

সংশয়ে সেলাই করা কাথার মতো কুঁচকে উঠলো সাধুর কপাল। তিনি বললেন, আচ্ছা যাচ্ছি। দেখছি গিয়ে,—বাঁজা গাছে কেমন ডালিম ফলে। ডেঁপো ছোকরা কোথাকার!

বালক বসে আছে অন্ধকারে—গাছের গুঁড়িটি বেশ শান্ত। আঁধার জঙ্গলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন সর্বানন্দ। বালকের সঙ্গে এই ছেলেখেলার ব্যাপারে মনের ডগায় তাঁর একটি মৃদু আপত্তি ছিল, তবু কী যেন এক দুর্বার জিজ্ঞাসায় তিনি এগিয়ে চললেন।

দূরে তাঁর আখড়ায় চুল্লির আগুন সারাদিন জ্বলে নিভু নিভু। ভোরে ব্রাহ্মস্নান সেরে চুল্লিতে অগ্নিসংযোগ করেন তিনি। তখন থেকেই বসে থাকেন—চলতে থাকে ঢেলা বাঁধার কাজ। যেন নিবিড় কোনো কেচ্ছাকাহিনীর মতোই এই সাধু-কাহিনী দিকদিগন্তে ছড়িয়ে যায়। ভিড় বাড়ে। সন্ধ্যার পূর্বে শেষ গোধুলিতে ঠাকুর কুশের আসন ছেড়ে ওঠেন। নদীতে যান সান্ধ্য স্নানে।

অন্ধকার ছিঁড়ে-খুঁড়ে ডালিম গাছের তলায় এলেন সর্বানন্দ। দেখলেন কোথায় ডালিম? বিষাক্ত কোনো ফলের মতো লালসালুতে বাঁধা মিথ্যার মোড়ক-গুলি, ধোঁকাবাজির ঢেলাগুলি বোকা বানরের মতো ঝুলছে গাছে। ফুল নেই। ফল নেই। পাতায়-পাতায় যেন এক রহস্য, অচিন রহস্য।

সে অন্ধকারের কাহিনী—এক-একটি মানুষের ভুল, কানা বিশ্বাস যেন ঝুলছে। এখন যদি অলৌকিক এক ক্রুদ্ধ আক্রোশে জেগে ওঠে গাছ—একটি-একটি করে সেই ফল যদি পড়ে বুড়ো সর্বানন্দের মাথায় তবে তিনি বাঁচবেন কি? যেন ভয় পেলেন সাধু। ঘুরে এলেন, গাছের তলা থেকে নদীধারে ফিরে এসে বললেন—দেখি কোথায় তোর ডালিম?

ততক্ষণে বালকের খাওয়া শেষ। সে হাত দিয়ে নিজের উদোম পেটটা দেখিয়ে দিলো। সাধু রেগে গেলেন—আমার সঙ্গে ইয়ার্কি?

বালক বললো, সত্যি খেয়ে নিয়েছি। আবার কাল—

—মিথ্যে কথা—

—মিথ্যে বলবো কেন? এখন তো রাত। নইলে ওই শ্মশানে গিয়ে দেখিয়ে দিতাম কোনটা মিথ্যে আর কোনটা সত্যি। এখন গেলে ভয় পাবো। ভূতে ধরবে। বিছানায় ঘুমের মধ্যে কঁকিয়ে কঁকিয়ে উঠবো। কাল সকালে মা মারবে। তারচে

আজ রাতটা কাটুক কাল ভোরে তুমি এসো এই গাছের তলায়, ঘাটে। আমি তোমাকে নিয়ে গিয়ে ডালিম গাছ দেখাবো। ফল দেখাবো—

কেন কে জানে এক অনির্বচনীয় কারণে সাধু সর্বানন্দের আজ এই বালকের কাছে নিজেকে অসহায় মনে হলো। তিনি ফিরে এলেন আখড়ায়। মন মরে গেল তাঁর। ভৈরবীর সঙ্গে কোনো কথা বললেন না। সন্ধ্যায়-সান্ধ্য বন্দনা হলো না আজ। প্রাণ উপবাসী রইলো। ঘুম এলো না চোখে! মাঝরাতে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দেখলেন নদীপাড়ে অশান্ত হাওয়া ক্ষ্যাপা মেয়ের মতো ছুটছে। হঠাৎ ভয় লাগছে কেন? তিনি কি ক্রমশ কুঁজো হয়ে যাচ্ছেন? বয়স বেড়ে গেল! দূর থেকে নিযুত আঁধারে ডালিম গাছটাকে অস্পষ্ট অশরীরী কোনো প্রেতাত্মা মনে হচ্ছে। আবার ভয় লাগে, ক্ষণে ক্ষণে চমকে ওঠে রক্ত। গোমড়ামুখী পুব আকাশে আস্তে-ধীরে আলো ফোটে, হাসি ধরে। পাখি ডাকে বাঁশবনে। গেরস্থ সংসারে জাগে মোরগ। সাধু কাঁধে গামছা ফেলে নদীর ধারে এলেন। দেখলেন, বালক নেই, এখনও কিছু আঁধার আছে।

ব্রাহ্মমুহূর্ত এখনো আসেনি। শেষ চাঁদের আলো এখনও। তবু জলে নেমে পড়লেন সাধু। স্নান করে পুবমুখী হয়ে উচ্চারণ করলেন—

ওঁ জবাকুসুম সঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং
ধ্বান্তারিং সর্বপাপঘ্নং প্রণোতস্মি দিবাকরম্—

একথা যেন দেব দিবাকর মেঘের আড়াল থেকে শুনলেন। সর্বানন্দ চোখ খুলে দেখলেন—গাছের তলায় বালক দাঁড়িয়ে আছে। যেন কৃষ্ণলীলা। গামছায় গা-হাত মুছে তিনি উঠে এলেন তীরে। তাকালেন বালকের দিকে।

নদীপাড়ে তখন মানুষের পারাপার শুরু হয়ে গেছে। মাছ ব্যাপারিরা ভোরের মাছ শহরে চালান পাঠাচ্ছে প্রথম লরিতে। টেমি বাতি তাব শেষ প্রাণশক্তিটুকু নিয়ে জ্বলছে দূরে কোথাও গৃহস্থ সংসারে। আকাশ থেকে হিম নামছে। মায়াবী জ্যোৎস্নায় আবছা নীল হয়ে আছে ভুবনদরিয়া। এখন ভাতের চিন্তা জাগে না। ভাতের অভাবে মরে না মানুষ—মরে প্রাণের জ্বালায়। যেন জল থেকে একটা বড়ো দীঘল বোয়াল মাছের মতো তড়াক করে লাফিয়ে পাড়ে উঠলেন সর্বানন্দ। হাঁটতে লাগলেন বালকের পিছে পিছে।

কত যুগ যুগান্ত ধরে, কোটি-কোটি বছর ধরে মানুষের এই হাঁটা। পদযাত্রা। পায়ের তলায় মাটি হাসছে। গর্জন করছে। ভেঙে গুঁড়িয়ে চুনচুন হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে মহাজগতের আঁধারে। সৃষ্টি ও লয়ের গূঢ় অভিসন্ধির ভেতর দিয়ে যাচ্ছে

দু'জন। ডালিম গাছকে চেনে না কেউ—শুধু শুনেছে গাছ তার শরীর ফাটিয়ে অপূর্ব এক ফল ধারণ করে। দেহবৃক্ষ সচল হয়। কত মূঢ় মানুষ, কত ইচ্ছা-অনিচ্ছা, কত অপূরিত বাসনা, বেঁচে থাকার জন্য সংগ্রাম—একটি ডালিম গাছকে লক্ষ্যকরে মানুষের জয়যাত্রা। ক্রিক্ ক্রিক্ শব্দে পাশ কেটে উড়ে যাচ্ছে রাতপাখি। অপুরিত বাসনার সন্ধানে সেও চলেছে হাওয়ায় বাতাসে, স্বপ্নে স্বপ্নে, সুরলালিত্যে। ঠকছে জিতছে। ইহলোকে ধুসর বালির বিছানায় শুয়ে থাকা কুকুর, ঘাস, পোকার শরীরে আঁকাবাঁকা চাঁদের হাত। বালক বললো—ওই দ্যাখো—

—ও তো লালশালু বাঁধা ঢেলা—

—উহুঁ—

—কী—তবে কী?

—ডালিম। লাল লাল পাকা ডালিম। পেড়ে খাও এই বেলা। নইলে ঠকবে—

—কী হবে—

—পাখিতে খাবে—

—ডেঁপো ছোকরা—ওই গুলান ডালিম? রহস্য করচিস আমার সঙ্গে। দেখবি মন্ত্র পড়ে ভস্ম করে দেবো—

বালক সশব্দে হেসে ওঠে। সীসার রঙে জল দেখা যায় নদীর ভেতর—সেই আয়নায় বুঝি পৃথিবীর মুখ ভেসে ওঠে। বালক বলে—হাত বাড়াও—হাত বাড়াও না—পেড়ে দেখো। ঠিক বলি কি মিছা বলি দেখবে তখন—

সবল পুষ্ট আনারস পাতার মতো দীর্ঘ হাতটি বাড়ালেন সর্বানন্দ। যেন চিনতে পারলেন—ঋজু একটি বালকের সুন্দর দু'টি হাতের মতো সুগোল টানা কাণ্ড দু'ভাগ হয়ে আকাশের দিকে এগিয়ে—তারপর থেমে গেছে। কচি ডাল। সবুজ পাতার ঝিলিমিলি হাওয়ায়, যেন বালকের হাসি। হাত বাড়িয়ে পাড়লেন সর্বানন্দ, সত্যি সত্যি বালকের হাতের পুতুল বনে গেছেন তিনি।

তখন ডালিম গাছের মাথায় পড়ছে শেষ ভোরের ঠাণ্ডা হাওয়াটি।

—পেড়েছো—এবার ভাঙো—

ভাঙলেন সর্বানন্দ। দেখলেন লালশালুর ভেতর ইটের ঢেলা। গাছে ফুল নেই, ফল নেই, শুধু পাতা। রেগে উঠলেন তিনি। কিন্তু এবার আর ভস্ম করার কথা বললেন না। হেরে যাওয়া মাঠে পরাজিত বুড়ো কোনো খেলোয়াড়ের মতো পিছন দিকে মুখ ফিরিয়ে পশ্চাদপসরণ করলেন।

হেসে উঠলো বালক। বালক—এই ছাখো—

এই বলে সম্ভাবনার ভারে ঝুলে আসা গাছটির একটি ডাল ধরে একটি ঢেলা পাড়লো বালক। পেড়েই দাঁতে কামড়ে হু'ভাগ করলো সেই ফলটিকে। সাধুর চোখের সামনে টকটকে তাজা সেই দু'টি ভাগকে মেলে ধরে বললো—কী ঠিক বলিনি ? এই ছাখো—

যেন মানুষের রক্তবিন্দু ডালিমের দানায় দানায় জীবদান পেয়েছে। রক্তাক্ত হয়ে আছে পাকা ডালিমের ভেতরটি। সত্যিকারের সেই ফলটির দিকে তাকিয়ে ঠাকুর সর্বানন্দ স্থির হয়ে গেলেন ! আশ্চর্য এই জগৎ ! নাকি তাঁর ভ্রম !

প্রাণীতন্ত্র

গমের শীষে দুধের ক্রিয়া চলছিল তখন। একটি চাষী মাঠের মধ্যে বসে পাশুনি কোদাল দিয়ে আলগা করে দিচ্ছিল মাটি। আর কিছুদিন পরেই মানুষের ভোগে লাগবে গম। ভামা পোকা বিঁধেছিল নরম ধানের থোড়—এ বছর মানুষের মুখে তাই হাসি নেই। দুপুরবেলা বটবৃক্ষের পাতা হাওয়ায় দোলে। পাখির পেট থেকে ময়লা সাদা চুনের মতো ঝরে যায়। ভি এল ডবলু আসার পর এই গ্রামে সরকারি ধানের চাষ প্রথম চালু হলো।

বর্ষাকালের অব্যবহিত পরেই বালি মাটিতে এখানে ছাতু ফোটে। ব্যাঙ ছাতু, বালি ছাতু, কাড়ান ছাতু। পরিত্যক্ত খড়ের পোয়ালে কেন্নোর গাদায় পোয়াল ছাতুর রঙ অনেকটা রোদে পোড়া মানুষের মতো তামাটে। এই ছাতু খুব সুস্বাদু হয়, শোনা যায় সাপেরাও নাকি ছাতু খেতে জানে।

ভরদুপুরে পুকুরের জলে নবীন মাছেরা ফুট ছাড়ে, আর প্রবীণেরা পাঁক ঘেঁটে ঘেঁটে খায়। তখন বটগাছটির মাথায় একটি শালিক উড়ে এসে বসল। ঠোঁটের ফড়িংটি ভাগ করে খাইয়ে দিল তার স্ত্রীকে। নিজে খেল। তারপর দুজনে মিলে নীল আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল। গতকাল রাতে বুঝি ঠাণ্ডা লেগেছে, হাঁচলো বউ। তারপর দুজনে মিলে গোপিবল্লভপুরের দিকে উড়ে গেল।

এটা নির্জন দুপুরের কথা। চাষীর চোখে পড়ল এইসব। চাষী বোবা। কথা বলতে পারে বলে আর পাঁচটা প্রাণীর থেকে মানুষকে আলাদা করে দিয়েছে পৃথিবী, সভ্যতা তাদের অন্যরকম। কিন্তু যার মুখে রা নেই সে শুধু তাকিয়ে দেখে পৃথিবীতে অনেক কিছুই ঘটে যায়।

বটগাছটির ডালে পাখিদের ঘর-গেরস্থালী। একটি সাপ নধর শরীর নিয়ে

সবুজ ঘাসের ওপর শুয়েছিল। সকালে শিশির কখন শুকিয়ে গেছে, কারণ আকাশে মৃদু মেঘ। সাপটির মাথায় জোড়া খড়মের দাগ। মাঠ কাটা এখন শেষ, পৃথিবীতে শান্তি। মহাকাশের নিচে নিজের খেয়ালে শুধু ফড়িং উড়ে বেড়ায়।

সাপের ঠোঁট থেকে ফণা বেরিয়ে আসে। সবুজ ঘাস দংশন খেয়ে আকাশের দিকে তাকায়। মাটির ভেতর থেকে বেরল উচ্চিংড়ে। গমের বনে চাষী আগুনে বিড়ি ধরিয়ে যায়, কপাল থেকে ঘামের ফোঁটা ঝরে ঠোঁটের ওপর পড়লে বোঝা যায় এটা উপকূলভূমি—সামনাসামনি কোথাও সমুদ্র আছে। সাপটি যেন নড়ে-চড়ে গা ঝাড়া-পাড়া দেয়।

তারপর দুলকি চালে এগোয় বিষধর। এই সময় একটা কুকুর ডেকে উঠল কোথা থেকে। কিন্তু সাপের কান নেই, পৃথিবীতে কম্পন এলে সে শুধু বুক দিয়ে শোনে। তার নাম গোখরো, পিঠে সূর্যের আলো পড়লে সংসারের দামী সোনার চেয়েও তার মহিমা বেড়ে যায়। মনসা গাছের পাতার নিচে লতার মতো পড়ে থাকলে মানুষ তাকেই ভগবান বলে পূজা করে। দেশগাঁয়ে তারও কিছু বন্ধু আছে, —ধান-কেউটে, দুধে-খরিস, গাছ-চ্যামনা—এদের নিয়ে এক আশ্চর্য অথচ অন্য-রকমের সংসার আছে। সেকথা চাষী জানে না।

শালিক আর তার বউ-ঝিয়ে এখন গাছের তুঙ্গে। বটগাছের সবুজ পাতা ঈশ্বরের দাক্ষিণ্য পেয়ে অলীক আনন্দে দুলতে থাকে। বাসায় চারটে কচি শালিকের ঠোঁট কাঁচির মতো তীক্ষ্ণ, বটগাছের লাল ফল হলদে বীজের গুণে আহা শিশু-গুলোর শরীরে যে সবে পুষ্টি লেগেছে!

ঘাস থেকে লম্বা শরীর টেনে হাঁটছিল গোখরো। বটগাছটি চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে একা। একটা গাই গোরু, কতই বা বয়স হবে তার, এখনো কচি জোয়ান। সবে দু দাঁত ভেঙেছে, খুব শ্যামলা গায়ের রঙ তাই শরীরের যৌবন তাকে দেমাকি করেছে। হৃষ্টমনে হাসতে হাসতে এগোচ্ছিল গাইটি, তার মনে পড়ছিল ঘোষদের বাড়ির ষাঁড়টির কথা। এমন সময় সাপটিকে দেখে সে একটা কচি ছাতুর উপর হোঁচট খেল, আরে সেদিন রাতে গোয়ালঘরে এই ব্যাট্যাই কি পা-বেয়ে উঠে এসে দুধ খেয়েছিল! ভয়ে উদাসী চোখ মুহূর্তে নীল হয়ে গেল তার।

হঠাৎ গাছের তুঙ্গ থেকে চোখ পড়ল পাখিদুটির, আর হৃদয় এতটুকু হয়ে গেল। বটগাছটির গুঁড়ি বেয়ে সাপটি উঠে আসছে ওপরের দিকে। শালিক আর শালিকিনী চিৎকার করতে শুরু করল। সেই হাহাকার শুনে দৌড়ে এলো টিয়া, দোয়েল, পান-কৌড়ি, পায়রা, কাক, চড়ুই, রামসারস, বক, কাঠঠোকড়া—আরো কিছু তুচ্ছ পাখি।

গমের মাঠে চাষী শুনল কি শুনল না বোঝা গেল না। ঠ্যাং তুলে বেহায়ার মতো সেই গাইটি কিছুটা গরম গোবর ফেলল মাটিতে। একটা ছাগল অনবরত পাগলের মতো ডিগবাজি খাচ্ছে রাস্তায় আনন্দে। পৃথিবীতে কি ঘটতে যাচ্ছে সে জানবে কেমন করে।

গোখরো এগিয়ে আসছে দুরন্ত পায়ে। ট্রেন লাইনের ট্রেনের মতো আসছে। তীক্ষ্ণ চোখদুটিতে কেমন এক জান্তব তেজ। সবুজ পাতার ভেতর দিয়ে যেন গলন্ত আগুন আসছে নরক থেকে। গায়ে চাকা চাকা দাগ, গাছের ডালপালা বুঝতে পারে তাদের আশ্রয়ে কার খসখসে শরীর যেন ক্রমশই ওপরের দিকে উঠে যাচ্ছে।

মানুষের ঘরে খড়ের চালে যার বাস সেই ছোট্ট চড়ুই প্রথম বুদ্ধি যোগাল। বউ-বউয়ের সঙ্গে, যুদ্ধে নামে শাশুড়ি-ননদ, সব দেখেছে পাখি, কিভাবে আক্রমণ করতে হয় তা শিখেছে গেরস্থের মেয়েছেলেদের কাছ থেকে। চড়ুই বলল, চিরিকচিরিক অর্থাৎ আমরা সবাই একযোগে ঠোক্কর মারব গোখরোর শরীরে, মাথায়, লেজে।

কাক বলল, কা—অর্থাৎ আমার ঠোঁট তীক্ষ্ণ, আমি ঠুকব মুখে—

বক বলল—ক্যাক্‌ক্যাক্—অর্থাৎ আমিও আছি তোমার সঙ্গে।

কাঠঠোকরা বলল, কুক্‌কুড়কুড়, অর্থাৎ আমার ঠোঁট বঁটি আছে, পিঠ ঠুকরে রক্ত দেখব শালার—

এই সময় রোদ মাথার ওপরে গনগন করে। পাখিগুলি যেমন ডাকাডাকি করছিল গাছের ওপর তেমনি নদীর ঘাটে কিছু মানুষ আর হাঁস ডাকাডাকি করছিল। নানান প্রাণী আর জীবজন্তুর ডাকে সরব এই গ্রামটিতে আগামী মাসের ১৭ তারিখে নির্বাচন। গভীর রাতে রেশন দোকানে বস্তা ফুটো করে ইঁদুর চাল টেনে খায়। কাঠবেড়ালি খুব দুপুরে কুটুস করে ধান খুঁজতে গেলে মনে হয় বুঝি ঈশ্বরের দিকে তাকিয়ে হাতজোড় করে পাপ স্বীকার করছে।

ঝাঁপিয়ে পড়ল পাখিগুলি। মারল ঠোক্কর, সাপটির পায়ে, পিঠে, মুখে, মাথায়। বিষধর এগোতে পারল না। নির্জীব কোনো প্রাণীর মতোই থমকে গেল প্রথমে। কোনোরকম উচ্চবাচ্য করল না। তবু থামল না পাখিরা, তির্যকযোনির এই ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র প্রাণীগুলির প্রবল পরাক্রমের কাছে প্রায় হেরে গিয়ে গোখরো পিছু হটল। সরসর করে নেমে এল মাটির দিকে। চলে যাচ্ছে দেখে আশ্বস্ত হলো পাখিরা, ফিরে এল গাছের তুঙ্গে। সেই যেখানে শালিক-শালিকিনের শিশুগুলি রোজই একটু করে বড়ো হচ্ছে।

সামনাসামনি একটা গর্তের ভেতর গিয়ে ঢুকে গেল সাপ। ঢুকে চুপচাপ পড়ে রইল। মুখটি শুধু পৃথিবীর দিকে। চতুর শৃগালের মতো চোখদুটি গর্তের ভেতর থেকে বটগাছটিকে দেখছিল, মহীরুহ বলতে হবে। আরেকদিন মউচাকের মধু খেতে গিয়ে কম বেগ পেতে হয়নি গোখরোকে। খঁচে গিয়েছিল বাবা মৌমাছিরা, হুল দিয়ে বিঁধতে বিঁধতে পিঠে চাকা চাকা করে ফুলিয়ে দিয়েছিল। গর্তের ভেতর নিজেকে সঙ্কুচিত করে রেখেছে তাই খুব খিদে পেল গোখরোর। প্রকৃত সাপের মতো করেই হাই তুলল সে।

গমের বনে কৃষিকাজের ফাঁকে বসে বসে চাষী মানুষদের কথা ভাবছিল। এই সাড়ে চার কাঠার ছিয়া জমিটাকে ঘিরে গত বছর বড়ো ভাইয়ের সঙ্গে মারপিট হয়ে গেল। রেগে গিয়ে টাঙি দিয়ে বড়ো ভাইয়ের একটা হাত নামিয়ে দিয়েছিল সে। সেটা ছিল রাজনৈতিক লড়াই।

কোনোদিকে কোনো সাপ নেই দেখে পাখিরা ঠিক করল ভাগাড়ের দিকে উড়ে যাবে। একটা পচা বিড়ালে পোকা ধরেছে খুব। খুঁটে খুঁটে খাবে, পাখিদের খিদে পেয়েছে। উড়ে গেল তারা। সেই ফাঁকে গর্তের ভেতর থেকে গোখরো বেরিয়ে এল বাইরে। তারপর সেই পাখির বাসাটিকে খেয়াল করে এগোতে লাগল।

ততক্ষণে পাখিরা ফিরে এসেছে গাছে। হৃষ্ট হৃদয়, গাছের তুঙ্গ থেকে বেশ কিছুক্ষণ ধরে পৃথিবীকে দেখল তারা। দেখল নীল আকাশকে। এমন সময় নিচ থেকে এক অদ্ভুত গরম হাওয়া ছুটে এল, লাগল পালকে, গায়ে। হাত তুলল পাখিরা, ঘাড় তীক্ষ্ণ করে তাকাল চারদিকে। পা-জোড়া টান টান করে মনোযোগী হয়ে উঠল। বক বলল কথা—সেই শালা সাপ, ওই দেখ—এগিয়ে আসছে।

এখন গোখরোর চোখ দুটি মারাত্মক নীল বলে মনে হলো। ভয় পেল পায়রা। সংসারে তার স্ত্রী আছে। পুত্র কন্যা আছে। একবছরের ছোলার দানা ঠোঁটে করে বয়ে এনে বছর খোরাকি জমিয়েছে। এখনো ঘুরতে ঘুরতে তীর্থে সাগর-পারে যাওয়া হয়নি তার। জীবনের অনেক কিছুই বাকি আছে। এই ভেবে পায়রা পালিয়ে গেল উড়ে। পাখির ঝাঁক থেকে একজন চলে গেল বটে কিন্তু অন্যান্যরা যেন তা গ্রাহ্যই করল না। বরং আরো দুর্বার হয়ে তীক্ষ্ণ ঠোঁট নিয়ে তারা ঝাঁপিয়ে পড়ল গোখরোর ওপর।

নিজের শক্তির কথা জানে সাপ। আবার ফিরে এল মুহ্যমান মুখে। কিন্তু হৃদয়টি তার সজাগ থাকল।

দিনান্তে পৃথিবী এবার কালো হবে। সূর্য যাবে দিগন্তে তলিয়ে। মাঠের চাষী

ঘরে তো কখন ফিরে গেছে। প্রকাণ্ড মাঠে বিকেলের ছেলে-ছোকরারা ফুটবল পিটছিল। সেইসব পাখিরা এখনো গাছের তুঙ্গে, যাদের এখন গান গাওয়ার কথা তারা যুদ্ধের মন্ত্রে জীবনের যন্ত্রে শান দিচ্ছে। গোখরো নিজেকে জাগিয়ে নিয়ে আবার উঠল আরও উপরে।

সবুজ বটের পাতায় এখন প্রায় সন্ধ্যার আনন্দ তিরতির করে নাচে। লাল বট-ফলের রঙ গাঢ় লাল হয়। একটা কোকিল, পৃথিবীতে যে বসন্ত চিনেছে শুধু তার কোনো গোষ্ঠী নেই, জাতি নেই—সংসারে এরকম একা একা অনেকেই থাকে, তারা যুদ্ধে যায় না, বিপ্লবে নেই উৎসবেও নেই—তাদের মতোই আত্মকেন্দ্রিক ডাকছিল কোকিলটা। সে ডাক শুনে চক্রবর্তী পরিবারের ঘরের পিছনে অবহেলায় বেড়ে ওঠা গোলঞ্চ গাছের ফুলটি যেন শুধু এককোঁটা হাসি ফেলল মাটিতে। নানান অভিযোগ অব্যবস্থা যখন প্রাণী জগৎকে তছনছ করছে, ভাঙছে গড়ছে ঠিক তখনই গোখরো এগোচ্ছে নতুন বিক্রমে।

আবার নামল পাখিরা, যে তীক্ষ্ণ ঠোঁট খুলে তারা গজল ছড়িয়ে দেয় ভোরের আলোয়, সেই ঠোঁট ধারালো করে তারা কোমর বেঁধে নামল লড়াইয়ে। তখন একদল মানুষ কথা বলতে বলতে যাচ্ছিল রাস্তায়, পাখিরা জানে মানুষ তাদের মতো কথা বলতে জানে না, শুধু ডাকাডাকি করে। কথা বুঝতে পারলে হয়তো পাখিগুলি সাহায্য চাইত মানুষের কাছে। গোরু, ছাগল কিংবা গভীর জলের মাছের কাছে।

সাপের পিঠ থেকে রক্ত নামল, সংজ্ঞা হারিয়ে গোখরো গাছ থেকে খসে পড়ল মাটিতে। তারপর মারা গেল সে। ছুটে এল পিঁপড়ে, মাছি, বোলতা।

তারপর জ্যোৎস্না নামল পৃথিবীতে। সেই আলোয় চারদিক ফট ফট করছিল। শালিক আর শালকিনী ধন্যবাদ জানাল পাখিদের। পাখিরা উড়ে গেল যে যার ঘরে। এখনো রান্নাবান্না বাকি, ঝুটিবাঁধা হয়নি তাদের, কারো স্বামী কারো স্ত্রী অপেক্ষা করে পথের দিকে তাকিয়ে আছে। কেউ হয়তো ফিরে গিয়ে নাটকের রিহার্সাল দেবে। আনন্দে হাই তুলল বক, কাক হাসল খুব কতটা, অবিবাহিতা চড়ুইয়ের আজ ঋতুর যোগ, অবসন্ন শরীরে উড়ে গেল সে। শালিক আর শালকিনী দেবাদিদেব গরুড়কে স্মরণ করে বাচ্চাদের বুকের কাছে নিল, তারপর সুখ-দুঃখের গল্প করল। শালিক শালকিনীকে বলল, রামসারসের দিকে অমন করে তাকাচ্ছিলে কেন? মিথ্যে কথা বলে আরও কাছ-ঘেঁসে বসার কৌশলে জপিয়ে নিল বউ। খুব আদর করল।

গভীর রাতে স্বচ্ছ জ্যোৎস্নার পথ ধরে গোখরো এল চুপিচুপি, পা টিপে টিপে। খেল। এবং পালিয়ে গেল। জনপ্রাণীহীন পৃথিবী এখন—শুধু মা আর বাবা চিৎকার করল ক্রমাগত। একটি রাতপাখি, তার নাম বাদুড়, সে দৌড়ে এল কিন্তু কিছুই করতে পারল না। নরম জ্যোৎস্নার ভেতর দিয়ে ঈশ্বরের মহিমা এসে ছড়িয়েছে পৃথিবীতে—সেই মহিমায় পাগল দুটি পাখি শুধু ওড়াওড়ি করল কিছুক্ষণ।

এক জীবনের মায়া

তিন দিনের ভেজানো জাবমাটি নাক দিয়ে শোঁকে হাবু। গেঁজে ওঠা কাদার বাসি গন্ধটা পেটতক উঠে আসে। কালো পাঁকের মতন বরন ধরেছে মাটি। খাসা দেয়াল উঠবে। পুরোনো আমনখড়ের ছন পড়লে জাবমাটির তেজ বাড়ে। তখন ভারি বর্ষাতেও দেয়াল গলবে না। কাদামাটিতে নেমে পা দিয়ে ঠেসে চটকে নাও। ভিতে মাটি ধরবে ভালো। এবার গাঁথো। চোখ বুজে গাঁথতে পার—ছয় সাত সন আর দেয়াল জাবকাতে লাগবে না। ছিটেবেড়ার বাঁশ যদি ভালো থাকে তবে তো বালাই নেই। ভাবতে লাগবে না। খাও দাও আর শোও। কেমন সুখের জীবন বলো দিকি! কেমন সোয়াস্তি। বুড়ো বয়সে হাড়ে জিরানের তখন কোনো অভাব থাকবে?

চার রাত হাটতলির চাতালে কেটে গেছে। চোত মাসের রাত। বাতাসে মায়া লেগে আছে। কিন্তু আসছে বর্ষার মরশুম। একটা থিতু না হলে বিপদ। এমন হা-ঘরে কীর্তন আর কাঁহাতক চলে। ইঁটের ছাঁট দিয়ে উনুন। ডালপালার জালে চোখ ধোঁয়ায় বুজে আসে। ভাতে ভাত। ভাতে ফুট ধরতে ধরতে চোখ গলে যেন রস পড়তে থাকে বউয়ের চোখ বেয়ে। রাতের বেলা ইঁদুর, ছুঁচো আর পোকামাকড়ের সঙ্গে সহবাস। বিছানা বলতে খেজুরপাতায় বোনা মাদুর। সারা-দিনে তাতে আবার চরা মোরগের দল এসে বিষ্ঠা ছেড়ে যায়। দুর্গন্ধ! জীবনের এক নতুন স্বাদ পেয়েছে হাবু, হাবুর বউ স্বাদী। বউ-বেটার সঙ্গে বিবাদ হয়েছে।

বাস্তুভিটের ডাঙার দিকটা বেছে নিয়েছে হাবু। দেয়াল উঠবে এইখানে। সামনে লম্বা চর। কোদাল দিয়ে কুপিয়ে নিলে পুনকে শাক বোনা যাবে, পেঁপের চারা পুঁতলেও পোঁতা যায় কিংবা কুঁদরী লতা এনে ফেলে দেবে। লতিয়ে লতিয়ে

অজস্র কুঁদরী। হকসভার ডোবায় ফেলবে আগায় বর্ষার ডিম্রপোনা। তখন মাছ খায় কে?

রোদ পড়ে গেছে। বিকালের হাওয়া এখন শান্ত। হাবু কুড়ুল দিয়ে শুকনো বাঁশের মাঝ বরাবর ফাড়তে থাকে। স্বাদী তেলপাত দিয়ে মাজতে বসেছে তাদের একমাত্র বাসন কাঁসার ঘটিটা। এটিতে হাবু জল খায়। ছাহু আসে। ছাহু হাবুর বড়ো ছেলে।

ছাহু: বাপ ঘরে চ—

হাবু: না যাবনি। বুড়া হাড়ে কে অত ঝাল পুয়াবে?

ছাহু: একসঙ্গে থাকতি হলি পুয়াতে লাগে একটুন।

হাবু: তাই বলে বউবেটার লাথঝেঁটা?

ছাহু: কেউ তমাকে লাথঝেঁটা মারেনি। মা ঘরে চ—

স্বাদী: তর বাপকে বল, আমি বলি ছ্যানা আমার পেটের, থাকতি পারে কখনও। দেখলে ত—

হাবু: তপা কেমন আছে?

ছাহু: পরশু রাত থিকে জ্বর। এখন একটুন ভালো।

হবু: ডাক্তার দেখচে?

বৃদ্ধ বয়সে এসে পৃথিবীকে বড়ো বেশি স্বার্থপর বলে মনে হয়। জীবনে হাবু বড়ো বেশি একা। স্বাদী নাতিপুতিদের মাঝে টিকে থাকে কোনোমতে। সাংসারিক মায়া, টান, পৃথিবীর বিষয়-আশয় এই সব যেন নতুন করে মানুষকে ভাবতে শেখায়। প্রতিনিয়ত চোখে ধরা পড়ে পরিণত জীবনের ছবি। মানুষ ক্রমশ পৃথিবীতে বোঝা হয়ে যাচ্ছে। কে বইবে এত ভার!

ভরা বর্ষায় নদীতে জল লাফায়। তারই শব্দ অনবরত কানে আসে। সময়ের তালে শরৎ আসে। তখন আকাশ মুক্ত থাকে। হাবু আর স্বাদী এমন সোনালী দিনে দীর্ঘজীবন ভোগের জন্য কামনা করে ঠাকুরের কাছে।

রাত ঘন হলে বুড়োবুড়ি দিনান্তে বচসায় বসে। ছাহু, ছাহুর বউ-বেটা ইত্যাদিকে নিয়ে একটা চক্র তৈরি করে। তারপর চক্রটাকে ঘিরে ঘুরতে থাকা। প্রকাশ পায় ওদের মনোভাব, সমস্যা, ইচ্ছা—এও যেন-বা এক অনুবর্তন।

হাবু হাই পাড়ে। স্বাদী সোমত্ত বয়সের গল্প পেড়েছিল। শালবনীর জঙ্গলে কাঠ আনতে গেলে ফরেস্টবাবুরা কত কি বলত! জঙ্গলের সোনাপোকাগুলি যথার্থই

সুন্দর। বিনা টিকিটে বনে ধরা পড়লে মানুষজনদের বাবুরা চালান দিত চন্দ্রকোণা রোডে। তখন মেলাই ঝুট ঝামেলা।

হাবু হাই পাড়ে। স্বাদী এবার সজনেতলার গল্প পাড়ে। সজনেতলায় সবুজ ঘাস। সকালে অজস্র সাদা ফুল আসে। পালি পালি কুড়িয়ে তাপু ঘরে এনেছিল। তারই প্রসঙ্গ—

স্বাদী : অতগুলা ফুল, বেসন দিয়ে ভাজলো, খেয়েছিলে?

হাবু : কই না ত—

স্বাদী : তা দিবে কেনে বল। ই ত আর আমি লয়—

হাবু : যাক, যেতে দে।

স্বাদী : কিন্তু তুমি ত খেতে খুব ভালোবাস—

হাবু : বউবেটার ঘর, তারা না দিলে—

স্বাদী : কি আর দেয়। দেখি ত খাবার সময়। তমার পাতে—

হাবু : চুপ থাক। কথা উঠলেই কথা বাড়ে। একটু শান্তি দে।

স্বাদী : বউয়ের জ্বালায় কি আর শান্তি থাকবে—

হাবু : রাত বাড়ে। ইবার ঘুমাতে হবে। ঘুমাতে দে—

স্বাদী : ঘুমাও না তুমি। আমি কি ধরে রেখেচি।

আনন্দপুরের মাঠে উইমেকা। তাতে অজস্র ছাতু ফুটেছে। এ অঞ্চলে একে উইছাতু বলে। সাদা কুচিকুচি কুঁড়চি ফুলের মতো ছাতু। কুচো ছাতু। এই এ্যাত। রাঁধলে এইটুকু হয়ে যায়। ভাগবাটায় কুলিয়ে ওঠে না। স্বাদী আর তাপু ছাতু তুলছে :

—তাপু, যাসনি উখনে। ঢিবিতে সাপ থাকে।

তাপু কখনো কথার অবাধ্য হয় না। এটা তার গুণ। কি জানি কোথা থেকে পেয়েছে। মায়ের কাছ থেকে অন্তত নয়। সাবি আর তার ব্যাটা দুজনে প্রচুর ছাতু তুলেছে। সাবি মানে সাবিত্রী। হাবুদের পাড়ার শেষপ্রান্তে থাকে। ওর স্বামী নিতাই গেল সনে সাপকাটিতে টেঁসে গেছে। একটা ঢিপিতে কে ছাতু তুলবে, তাই নিয়ে তাপু আর সাবির ব্যাটার কোন্দল বাঁধে।

তাপু : এই, আমি আগে দেখেছি—

সাবির ব্যাটা : আমি কখন থেকে তুলব মনে করেচি—

তাপু : দেখস না, শালা বলচি—

সাবির ব্যাটা : তর ভয়ে নাকি ?

স্বাদী : এই সাবি, তর ব্যাটাকে থামাতে পারুহ্ ?

সাবি : তমার লাতিটা ধুয়া তুলসি পাতা নাকি !

স্বাদী : হ্যাঁ লা মাগী, ভাতার খাকি—।

ইত্যাদিতে কোন্দল বাঁধে। সাবির ব্যাটা তাপুকে ধরে মারে। তাপু একটু রোগা। পারে না ঠিকমতো। ভ্যাঁ ভ্যাঁ করে কাঁদে। ঘরে এলে তাপুর মা তিতি-বিরক্ত কণ্ঠে বলে ওঠে, ছ্যানাটাকে আমার অমন করে মারল্! নাক দিয়ে রক্ত ঝরছে। শালা দেখার কেউ নাই। বাপের ত ওলাউঠা হইচে। ছ্যানা লয় ত যেন বলির পাঁটা। যে যেমন করে পারচে মারচে। সাতকুলে কদর করার লোক নাই। ভাত বেড়ে দাও। সুখের সাত্তিরা সব খাবে, খেতে পারবে। খাওয়া তো না যেন পাথরের দলা গিলবে।

আঁচলে বাঁধা খুঁট থেকে ছাতুকটা উঠোনে ফেলে দিয়ে স্বাদী হনহন করে ঘাটের দিকে পা বাড়ায়। অমন কথায় সত্যি কার না রাগ বাড়ে! দৃষ্টি ভুল করেও একবার পেছন ফিরে তাকায় না। কে কার ধার ধারে! সে কি ভিখিরী নাকি ? শুধু যা গজর গজর করে। কাকে গাল পাড়ে শোনা যায় না। অদৃষ্টকেও দোহাই পাড়তে পারে। বেলা বাড়ে। জলখাবার সময় অতিক্রান্ত হয়ে যায়।

রাত্রিময় মেটে জ্যোৎস্না ছড়িয়ে আছে ইস্কুলডাঙার মাঠে। ডাঙা জমি তাই চাষ নেই। চাষীরা বিরি কলাই বুনেছে। তারই সবুজ পাতা এবং ফলের শুঁটিতে এত জ্যোৎস্না। হেমন্তের বাতাসে অল্প শীত ধরেছে। বুড়ো হাড়ে কাঁপুনি জাগায়।

স্বাদী : ব্যাটাকে বল না একটা কম্বল কিনে দিতে—

হাবু : টাকা পাবে কুথায় যে কম্বল কিনবে ?

স্বাদী : ক্যানে, কিংকরের জোতে ত ইবারে বিঘায় বাইশ মণ ধান ফলেছে। সাত বিঘা ত তমারই।

হাবু : কিন্তু না দিলে আমি কি করব ?

স্বাদী : ছ্যাখঅ, তার চেয়ে বেটাকে বল আমাদের আলাদা একটা খিতু করে দিতে। জমি যা আছে ভাগ কর। বুড়াবুড়িতে যেমন পারি থাকব। উ বউ-বেটা কেউ কারও লয়। যতদিন গতর থাকবে ততদিনই কদর।

হাবু : আমার না খুব নারকল-মুড়ি খেতে মন করে।

স্বাদী ছোটো করে দীর্ঘশ্বাস ফেলে। জীবনের নাকাল পথে হাঁটতে হাঁটতে

যে বয়সে এসে নিরাপদ নিশ্চিন্তে একটু বিশ্রাম নেবার কথা, সুখে মুখে ভাত তোলার স্বপ্ন দেখা, সেই বয়সে এসে মানুষ কেমন পরনির্ভর হয়ে পড়ে? নিজেদের জন্য তখন একটা আলাদা জগৎ তৈরি হয়। বার্ধক্যের এই বর্ণনা একমাত্র বুঝি বৃদ্ধরাই দিতে পারে।

শীত কাটতে না কাটতে হাবু কোদাল নিয়ে মাটি কোপাতে থাকে। মাটিতে এখন বেশ রস আছে। তবে সেই কতকালের তৈরি কাদামাটি। শুকিয়ে কাঠ হয়ে আছে। এবার আর কোনো কথাই নয়। হাবু ঠিক করে ফেলেছে আলাদা দেয়াল তুলবেই। এভাবে আর একসঙ্গে থাকা যায় না। চামড়ায় কোঁচ ধরা ইস্তক ঝগড়াঝাঁটি। ক্যানে বাপ, তমরা সুখে থাক না!

মাটি কোপানো হলে গুড়ের খালি নাদায় করে জল বয়ে আনে বুড়োবুড়ি। মাটির নাদায় প্রচুর জল ধরে। বয়ে আনতে আনতে স্বাদীর ঘাম ঝরে। ঝুরো মাটি থেকে ডিঁয়ে পিঁপড়ে ওদের পায়ে গায়ে কামড়ায়। তবু দেয়াল তুলবেই। পৃথক বাসস্থান বানাবে।

গোদাপিয়াশালের হাটে লঙ্কা বেচতে গেছল ছানু। ফিরতে রাত হয়েছে। এমনিতেই ক্লান্ত। তার ওপর পরিবারে এমন কলহ। ছানু নিজেকে সামলে কাজ করতে পারে। কর্তব্যকর্মে তার অসীম ধৈর্য। চাট্টি খায়। একটু বিশ্রাম করে। তারপর মনমেজাজ ঠাণ্ডা করে বাপ-মাকে এসে অনেক বুঝিয়ে ঘরে নিয়ে আসে।

চাষীরা পৌষমাসের ধান ঘরে তোলে বাঁকে, মাথায় আর গোরুর গাড়িতে করে। গাছের তলায় বড়াম পুজো হয়। তখন মানুষেরা মাটির ঘোড়া মাটির হাতি নিয়ে আসে কুমোরপাড়া থেকে। এতে ঈশ্বর তুষ্ট হয়। সংসারে লক্ষ্মী আসে। সোনার ধান দিয়ে খামার পুজো হয়। এমনি সময়ে গ্রামীণ চাষীদের ঘরে সুখ আসে। হাবুদের সাত বিঘা জমি। তারমধ্যে তিন বিঘা ধানি জমি। এক বিঘা কালা ফসল চাষ হয়, গম চাষ। তিন বিঘা ডাঙা। মেদিনীপুরের এ দিকটাতে বানের ভয় নেই। মাঝে মধ্যে খরা হয়। তখন মাঠকে মাঠ জলে যায়।

কপাল মন্দ তাই হাবুদের পরিবারে সুখ নেই। অশান্তি লেগেই আছে। ঘরে মন বসে না। মনে হয় বিবাগী হলে বুঝি জীবনে শান্তি আসবে। হাবু সন্ধে সন্ধে ঘরের দুয়ারে বসে লাটাই ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে শনের দড়ি কাটছিল। ছেঁড়া ধানের বস্তাগুলো সারাতে হবে। ইঁদুরে কেটেছে। মণ দুই তিল এসেছে মাঠ থেকে।

সেগুলো তো রাখতে হবে। ছানু কোথা থেকে একটা মোরগ কিনে এনেছে, রাত্রে খাওয়া হবে। ন'মাসে ছ'মাসে মোরগ হয়। কষ্টের পরিবার। সুখের মুখ দেখলে ছেলেপুলের মুখে হাসি ছলবলিয়ে ওঠে। তাপু, নিতাই দুজনেই খুশী।

রাতে কলাপাতা কেটে আনে ছানু। তারা বাপ-ব্যাটায় কলাপাতায় খেতে ভালোবাসে। রান্না হতে একটু রাত হয়েছে। তাপু আর নিতাইকে ঘুম থেকে তোলা হলে তাদের ঘোর কাটতে সময় লাগে। তারা বকবক করে। সব বাজে বাজে কথা। ছানুর বউ কলাপাতায় ভাত বাড়ে। পৌষমাসের ভাত। কলিচুনের মতো রঙ। ধোঁয়ায় সারা ঘর ভরে যায়। নতুন ধানের চাল সেদ্ধ হলে ভারী সুন্দর গন্ধ বেরোয়। বাপ-ব্যাটায় বসে গপ্পো ফাঁদে। সামখোল আর খড়হাঁসের কথা। কার মাংস কতটা সুস্বাদু তারই মাপামাপি চলছিল। ছানুর বউ বাটিতে মাংস ভাগ করতে থাকে। স্বাদী ভাত ধরে দেয়—হাবুকে, ছানুকে, তাপুকে, নিতাইকে।

স্বাদী: হ্যাঁ বউ, বাপের বাটিতে না হয় দু'কষা মাংস বেশিই দিতি—

বউ: ক্যানে, আমি কি সব ছ্যানাদেরই দিচি—

স্বাদী: ঐ ত ক'খানা হাড়। ক্যানে বুকের মাংস কি সব শেষ? কর্তা বলে কথা, তাকে একটু দেখেশুনে না দিলে হয়!

বউ: ঠিক আচে তুমিই বাড়, আমি পারবনি—

স্বাদী: আমি বাড়তে যাব ক্যানে—

হাবু: তমরা ঝগড়া করবে?

ছানু: মায়ের উ কথাটি বলা ঠিক হয়নি—

লণ্ঠনের আবছা আলোয় সংসারের আসল ছবিটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কেউ থামবে না। ওরা স্বামী-স্ত্রী এবং এরা স্বামী-স্ত্রীতে গলা বাড়াতে থাকে ক্রমে। রান্না মাংস পড়ে থাকে। বাচ্চারা সুযোগ পেয়ে হাত-পা ছড়িয়ে ঘুমোতে শুরু করে। দু'পক্ষের গলা রাত্রিকে অতিক্রম করে হাওয়ার মতো বইতে থাকে।

ছানুর বউ: কালকেই আমি বাপের বাড়ি যাব—

ছানু: তার থেকে আমরা আমাদের ভিন্ন থাকব—

হাবু এবং স্বাদী: হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই থাকব।

পরদিন গাঁয়ের পাঁচমাথা বসে ওদের হাঁড়ি কড়া আলাদা করে দিল।

প্রত্যেকের ভাগে একটা করে ঘর। শোয়ার ঘর। দুয়ারটাকে বাঁশের চাঁচ দিয়ে দুভাগে ভাগ করা হয়। তারপর বাসন-কোসন সবকিছুই।

সারাদিন পাড়ার বউ মেয়েরা আসে। ওদের ভিন্ন হয়ে যাওয়া নিয়ে গল্প করে। এটাই তো উচিত। ছেলের বে থা দিয়েচ এবার আলাদা করে না দিলে তাদেরই বা চলে কেমন করে! ছেলে বড় হয়ে বাপ-মাকে না দেখলে পাপ হবে তার। তমরা ক্যানে মুখ খুলে সেসব বলতে যাবে?

ছানুর বউয়ের কাছে গাঁয়ের বউরা আসে। কার শাশুড়ি কেমন মুখখেমটা করে তারই বর্ণনা করে। ধান, গম, কুমড়ো, তিল কার ক্ষেতে কতটা হয়েছে। কে কতটা বিলিয়ে দিয়েছে গাঁয়ের মানুষজনদের মধ্যে তার হিসেব দেখায়। কার স্বামী অঞ্চলের কেউকেটা, তার দাপটই বা কিরকম। এক্ষেত্রে বুড়োকে শায়েস্তা করার ব্যাপারে সেই শক্তি কিভাবে নিয়োজিত হতে পারে কথা হয়।

হাবুর ভাগে একটা বাছুর পড়েছে। স্বাদী সেটাকে দানাপানি দেয়। চারণে নিয়ে যায়। যত্ন আত্তি করে। একসময় এ-ই দুধ দেবে সের সের। হাবু দুপুর-বেলা পুকুরের টোকাপানা সরিয়ে স্নান করে আসে। তারপর খেতে বসে।

ওপাশের চাঁচের আড়ালে তাপু আর নিতাই এক্কাদোক্কা খেলে। খোলাম-কুচি খেলে। কিন্তু এখানে আসে না। হাবু কিংবা স্বাদীকে দেখলে দৌড়ে চলে যায়। ঘোষদের আশুধু ডাল থেকে মৌচাক ভেঙে মধু নিয়ে এলে এখন আর খাওয়ার জন্য ছাড়া-কামড়া করার লোক নেই।

দু-একবার ছানু আসে। কম কথা বলে। স্বাদী বাইরে গেলে ঘর ফাঁকা। দরজার সামনে বুড়ো একা বসে থাকে। মাঠ দ্যাখে আর গাছ দ্যাখে। কখনো বা মানুষজন। কেউ বলে—কি খুড়ো কেমন আছো? খুড়ো ঘাড় নাড়ে, নিরুপায় হাসি হাসে। বৃদ্ধবয়সের ভাঙাগালের কালচে চামড়ায় সে হাসি তেমন বিচ্ছুরিত হতে পায় না। দেহের রক্ত শুধু যা মানুষের সাড়া পেয়ে একটুখানি নেচে ওঠে। তাই ধরা পড়ে বহুকালের পুরোনো ধ্বংস চামড়ার পর্দায়।

ভোররাতের ঠাণ্ডা। বর্ষাকালের খড়ের চাল ফুটো করা জল। সকালবেলার রোদ···বুড়োবুড়ি বেশ আছে। কেউ পাশের লোকজনের সঙ্গে হেসে হেসে কথা বললে স্বাদী ভাবে তাদেরকে নিয়ে বুঝিবা ঠাট্টা করছে। বুড়ি তখন গাল পাড়তে থাকে। এ গালে অনেকেই আমল দেয় না। ধীরে ধীরে দু'জনের জন্য আলাদা একটি জীবন তৈরি হয়ে যায়। তৈরি হয় নতুন বাসস্থান, সেখানে ওরা দু'জন ছাড়া বাকি মানুষেরা সব উধাও হয়ে যায়।

স্বাদী: জানো, সেদিন ঘাটে আমাকে দেখে তপা দৌড়ে পালাল। ছানু বোধ-হয় মানা করেছে।

হাবু : হবে।

স্বাদী : মিটমাট করে ফেলা যাবেনি ? ছ্যানা বউ ছেড়ে আর কতকাল থাকা যাবে ! এক বছর ত হতে বসেছে।

হাবু : হুঁ।

ভাদ্রমাসের শেষের দিকে শুয়ে-মুতে স্বাদী নষ্ট হয়ে গেল। বুড়ির বয়স এখন অন্তত পঁয়ষট্টি। চেহারায় দুধ ঘি নেই। চুলা কাটা হলো সেই যেখানে দেয়ালের মাটি শুকিয়ে আছে সেখানে। ছানুর হাতের আগুনে মড়া দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। কাঠখড় দিয়ে ছানু তার মা-টাকে পুড়িয়ে ফেলল।

বাইরে ফাঁকা মাঠ। হাবু বেশ অলস হয়ে গেছে। শূন্যে চোখ মেলে বসে থাকে। এখন আর সে আলাদা থাকে না। ছানুর কাছেই থাকে। ছানুর আবার একটা মেয়ে হয়েচে। বড়ো দুটো বই বগলে পাঠশালায় যায়। বউমা রান্না করে। অমাবস্যা-পূর্ণিমায় হাবুর গা-গতর বেশি ব্যথা করে। জেঁকে দেওয়ার মতো কেউ থাকে না। সারাটা ঘর যেন নির্জন হতে থাকে ক্রমশ।

শীতকাল আসে। বাইরে রোদে হাবুকে শুইয়ে দেয় ছানু। তারপর রোজগারে যায়। সারাদিন রোদ খায় বুড়ো। ভাত খায় যেখানে, সেখানেই শোয়। বেলা বাড়লে বড়ো তেঁতুল গাছটা ছায়া দেয়। বাস্তু বানানোর নেশাটা ফিকে হয়ে যায়। এই তো তার বাস্তু। আলাদা বাস্তু দিয়ে কি হবে ? পৃথিবীর সব বুড়োরই তো এই বাস্তুটা আছে। যে যার নিজের মতো করে বানিয়ে নেয়। একা একা শুয়ে থাকে আর দু'চোখ দিয়ে মানুষজন দ্যাখে। এক বাস্তুতে মানুষ কখনও সারাটা কাল কাটাতে পারে না। নকল বাস্তুটা উধাও হয়ে গেলে তবে গিয়ে আসল বাস্তুতে এসে পড়ে। তার ওপরে সীমাহীন আকাশ আর নিচে মাটি, কাঠ, গাছপালা। হাবু এই সব দ্যাখে। মানুষজন জিজ্ঞেস করে অকারণে : খুড়ো কেমন আছ হে—?

হাবু জানায় : আছি।

জল অতলের বৃত্তান্ত

আঘুনের শীত আসবে এবার—ঘোর কাঞ্চনবর্ণ সকালে একগুচ্ছ কাক পচা কাতলা মাছে ঠোঁট ঠুকছে। নয়নাভিরাম এই ছবি ভুবনশোভায় ফুটে উঠেছে। দৃশ্যত কাক চরিত্রে এখন নব নব উন্মাদনা।

যেন ক্ষুধার্ত মানুষের মতো দেখছে মেয়েটা, তার ঠোঁটের দুপাশে কষ—বুঝি-বা মারাত্মক ঘুমের রেখা। দুটি চোখ উঠে গিয়ে স্থির হয়ে গেয়ে ভ্রূ-সন্ধিতে। নিকটস্থ ট্রেন লাইন থেকে ডাক এল। কাকেরা মগ্ন—মাছের ধ্বস্ত গন্ধ চৌদিকে রটাচ্ছে।

লোক দৌড়দৌড়ি শুরু করে দিল। মানুষের পাপের মতো কালো রঙের ধোঁয়া উঠছে ইঞ্জিন থেকে। গার্ড সাহেবের বাঁ হাতে পয়সা গুঁজে দিলেই ডাঁই-ডাঁই কাঁচা কয়লা। তাকে পুড়িয়ে টাকা কর। এই লোভেই ছুটছে লোকজনেরা।

বুড়ো বাপটাকে কাশ রোগে পেয়েছে। কাশতে কাশতে এগিয়ে যাচ্ছিল—ক্ষেপিকে দেখতে পেল, সে বেপথুমান, তাকিয়ে আছে ধ্বংস-প্রায় মাছটির দিকে। লঘু চোখে এগিয়ে গেল জনার্দন। বলল—কি রে? মা—

প্রথম দর্শনে এই মেয়েটিকে বালিকাজ্ঞানে ভ্রম হবে। কান্না, হিংসা, টাকা, গভীর রাতের ঘুম, আর্ত পাখির চিৎকার সবকিছুই আস্তে ধীরে বুঝছে বুলবুলি, চিনছে। যোজন যোজন রুক্ষ মাঠের দিকে সে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে কখনও। বা আশাহীন, নিশ্চিহ্ন কোনো অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ তাকে আগ্রহ দেয়। হঠাৎ হঠাৎ সে চিরমগ্নতার গুপ্তগর্ভ থেকে উত্থিত হয়। তখন খড়্গপুর থানার মানুষজন, শহরতলির প্রাণীকূল নাবালক আনন্দে ঘর-সংসার করে।

বাপের কথার জবাবে ক্ষেপি হাসে। মেঘবদ্ধ আকাশের দিকে তার আঙুল নির্দিষ্ট হয়। চোখ থেকে বেরিয়ে এসেছে অগ্নিপ্রভা এক মায়া, এ তার যৌবনকাল।

পতিতমান পচা মাছটির দিকে ধাবিত হয়। সে শব্দ করে—হুস, যাঃ! সেই শব্দে বেদনা, হুংকার নাকি ক্রোধ ছিল কে জানে, শুধু কাকদের চঞ্চলতায় হাওয়া উঠল এবং ক্রমশই সেই কা কা রবের মুখরতায় হারিয়ে যাচ্ছিল একফোঁটা সুশ্রী রুপালি কাতলা মাছটা। যেন-বা রাঙ্‌তা মোড়া—এমনই বেহায়া, মূর্খ।

জনার্দন দৌড়ে গিয়ে কাকগুলিকে হঠিয়ে দিল। হাতে করে তুলে নিয়ে এল সেই পচা ধ্বস্ত মাছটিকে। মুখ থেকে ভয় সত্বর উধাও। রোদের সোনালি স্পন্দন মেয়েটির মুখে। বোবা আনন্দে বাক্যহারা একটি জলস্রোত যেন ভেতর থেকে উৎসারিত হয়ে তার মুখমণ্ডলকে দৃপ্ত করে তুলল। সে হাসল। উপর্যুপরি হাসতে লাগল।

পাশে বাতাবি লেবুর গাছটা। যখন তারই একপাশে মাছটিকে মাটির নিচে পুঁতে দিচ্ছিল জনার্দন তখন তার একফোঁটা মেয়েটির চোখে বাল্য ব্যাকুলতা। বড়ো নিম্নগামী দৃষ্টি। স্খলিতবসন প্রায়—তাও নিম্নগামী।

বাতাবি লেবুর গাছের তলায় জনার্দনকে দেখে কয়েকটি বুঝহারা বালক দৌড়ে এল। মা বাবারা সবাই অভাবী, সংসারী, আটপৌরে। তারা কেন যে সব এক-চোখে একপ্রাণে লেবুর গাছে ঝুলন্ত বাতাবির দিকে তাকিয়ে আছে—পচবে, নির্ঘাত পচবে। পাখিকুল এখন উড়ন্ত—ধানক্ষেতের দিকে ধাবমান। আকাশ থেকে নীল বিলম্বিত লয়ে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। যেতে হবে জনার্দনকে। সে খর পায়ে এগোতে গেল। ছেলেগুলি ধনুকছিলার মতো বাঁকিয়ে ধরল সৌষ্ঠব—উবু হয়ে তাকাতে গেল। তারা লেবু খেতে চায়।

একটা ঝুলন্ত ডাল ঝুঁকিয়ে পাড়ল লোকটা। গর্ভবতী মেয়ের পেটের মতো রঙ ধরেছে ফল। ফাটিয়ে দিতে শুধু লাল।—বুলবুলি খাচ্ছে, ওরাও খাচ্ছে।—জনার্দন গুড়াকু দিয়ে দাঁত ঘষতে ঘষতে কোথায় চলে গেল।

কোথায় গেল জনার্দন—হাঁটতে হাঁটতে নদীধারের দিকে চলে গেল। একটি ছোটো আধ কাতলা মাঠ। এইখানে দশেরার দিন রাবণদাহ হয়। হিন্দুস্তানী, তেলেঙ্গি, বিহারী—খড়্গপুরের সব পাঁচমেশালি মানুষজন খড়ের রাবণের গায়ে আগুন লাগায়। এখন সেই মাঠটিও বড়ো ঠাণ্ডা হয়ে আছে। সেখান থেকে সোজা তাকালে চোখে পড়বে নদী কংসাবতী। বড়ো নরম নিবিড় এই নদীর জল। মানুষ খায়, গায়ে মাখে। কিন্তু অতলে তলিয়ে আছে যে গরল শুধু তার সন্ধান জানে না। জনার্দন মুখ ধুতে এসে সেই জলের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইল। যেন জলের দিকে নয় তার গভীরে শুয়েছিল যে পলিমাখা অন্তরটি তার দিকেই তাকিয়েছিল জনার্দন।

তখনই সোহাগবালা ঘরে কুলোয় ফেলে চাল পাছড়াচ্ছিল। একঝাঁক সাদা

পায়রা দেখে হাসিতে উছলে উঠল বুলবুলি। দৌড়ে গেল ঘরে, বেরিয়ে এসে উঠোনে ছুঁড়ে দিল একমুঠো চাল। আধুলি, সিকি কিংবা কাঁচা টাকার মতো ঠং-ঠং শব্দে চাল ছড়িয়ে গেল। পায়রাগুলি নেমে এসেছে। খাচ্ছে খুঁটে খুঁটে। চেঁচিয়ে ওঠে সোহাগবালা—হ্যাঁ লা ছুঁড়ি—চাল কি মাগনা আসে। সব্বনাশীর ঠাট দেখলে, অঙ্গে ঝাল বেটে দেয়। একমুঠো চাল কি মনে করে তুই খেলার ছলে উড়িয়ে দিলি! ই কি খেলার জিনিস!

বুলবুলি রা কাড়ল না। তার এঁটো হাতে তখনো পাকা ফলের রস লেগে আছে, জীবনরসের মতোই তা আঠালো। গতর দুলিয়ে আবার হেসে উঠল সে। পাশের ঘরটিতে কে ছিল কে জানে। তাকে ঠিসারা করে বলে উঠল—ওলো সুজনী—হা দেখে যা দেখে যা, কতগুলান পায়রা এসেছে আমাদের উঠানে।

টুনটুনির একটি টাকা—। সাধ করে মা-বাপ নাম রেখেছিল বুলবুলি। আহা বুলবুলি পাখি। তার উড়বার স্বভাব। চিকন কালা শ্যামের মতো চোখ নীল, কালো কোকিলার ডানার মতো দুটি হাত। এ মেয়েকে রাখতে পারলে হয়!

সোহাগবালার যত সোহাগ একদিন তা ছিল ওই বুলবুলির জন্য। যেন নিজের চোখের তারাদুটি মেয়ের চোখের ভেতর মাকুর মতো ঘুরত। এখন শেষ জ্যৈষ্ঠের জলে ধোয়া মালদহি আমের মতো বুলবুলির সর্বাঙ্গে রঙ ধরছে। ভয়ের কথা। গুড়ে হাড়ি দেখলেই লোকে ভাঙতে যাবে—এই হলো মানবচরিত। প্রথম প্রথম সংসারটি কেমন সাজন্ত লাগত। যেমন ছোটো নিদেন সংসার। তিনটি মাথার সংকুলান হতো—এখন, একটি জলন্ত উনুন—আগুন। লোকের গায়ে গা ঠেসিয়ে ধ্বংস হবার বাসনা তার।

বুলবুলি ঘরের চৌকাঠে পা ছড়িয়ে দিয়ে বসল। ছোটো ছোটো খুপরি ঘর। পায়রার খোপের মতো এককোঠা। ছেঁড়া চট, বাঁধাকপির খোসা, ভাঙা ইটের ছাঁট, মুখখোলা বোতল, ঝুঁটিদার লাল মোরগ এই সব ঘরের চারপাশে। আর আবর্জনা। বস্তি মানেই এককাঠা জায়গা,—একশ জনের মাথা ফাটাফাটি। চোখের সামনে ফাঁকা একচিলতে মাটি খালি পড়ে আছে। পায়রাগুলি পঙ্গপালের মতো নেমে আসে সেখানে।

দুধের সরায় উথলে ওঠা ফেনার মতো বাড়তে থাকে বুলবুলি। ঝকঝকে উঠোন—বুলবুলি বাড়তে থাকে। তক্‌তক্‌ করে অ্যালুমিনিয়ামের বাসন—বুলবুলি বাড়তে থাকে। এক বস্তি থেকে আরেক বস্তিতে হাওয়ায় হাওয়ায় খবর লাগে। বুলবুলি বড়ো হচ্ছে।

বুলবুলি বড়ো হলো। শরীর তার খাল বিল নদী নালার মতো ক্রমশ স্রোতে ভরে উঠতে লাগল। ভাটায় হারিয়ে যেতে লাগল। কোথায় যেন লুকোচুরি খেলা চলছে। রেল কলোনীর ছোকরারা সাইকেলে ঘন্টি বাজিয়ে দৌড়াদৌড়ি করল ঢের। খড়্গপুর ওয়ার্কশপের মাথা ফেটে আকাশপানে উঠল মিশকালো গরল ধোঁয়া—বুলবুলি প্রেমে পড়ল। বিড়লা ফ্যাকটরিতে ঘটাং ঘটাং মেশিনের শব্দ হয়। বুলবুলি ঢকঢক করে জল খেল প্রথম ক'দিন।

একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে সোহাগবালা দেখে তাজ্জব বনে গেল—ভরা কলসির মতো ভারি হয়ে উঠেছে বুলবুলি। ভ্রূ-র তলায় ভ্রূকুটি লাগে তার—লাউডগা সাপ নাকি চোখ খুবলে খায়। একা একা সে যেন চিরযমুনা তীরে দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটা। সেদিন থেকেই সোহাগীর মুখে বুলি ফুটেছিল—ও লো প্রেম মারানি,—ঘরকে আয় লো ধিঙ্গি ছুঁড়ি, কি অঘটন ঘটাবার লেগে অমন উসখুস করছিস তুই। ঘরকে আয় মা, ঘরকে আয়।

পুরাতন বাজার তেলেঙ্গিপট্টির পাশের জগৎটা একেবারে অন্যরকম। মানব সংসার যেমন হয়—মিথ্যার ফাঁদ এখানে পুরু করে পাতা। ভাত, মদ আর মেয়েমানুষ—এইগুলি মানুষের খাদ্য। তা বাদে খায় আটার রুটি। কাঁচালংকা, সস্তা গোরুর গোস। উৎসবে মোরগ ভোজ হয়। বাজার থেকে শুঁটকি মাছ আসে। শীতকালে তাতে সবুজ মটরশুঁটি পড়ে। লোধাভবনে রামজীর ভোগ খেতে যায় সব কানাইয়া—বালক-বালিকারা। লোধাবাবুদের বহু ধানি জমি আছে—বড়ো সুবোধ প্রাণী এই ধান। বিনা বাক্যব্যয়ে মানুষের জন্য এরা রাতারাতি টাকা-রূপ ধারণ করে। সন্ধ্যায় কেউ মহুয়া হলে অমিতাভ বচ্চনের পিকচার দেখতে যায়। বস্তির ঘরগুলি সবই প্রায় একই রকমের। অ্যাসবেস্টসের দেওয়াল মাথায় টালি ধরেছে। তারে মেলা থাকে—শুকোয় শায়া, ব্লাউজ, পুরুষের আণ্ডারপ্যান্ট পর্যন্ত। ভরদুপুরে রেডিওতে রবীন্দ্রনাথের গান বাজে অকারণে,—এই বস্তিটির নাম কৌশল্যা।

সোহাগবালা গজরাচ্ছে, মাগী চাল ছড়াবি তো উপায় করে নিয়েস্‌বি। সব শালা-শালি তো খাবার সাস্তি—। আনবার বেলা আমাকে কেনে গতর খাটাতে হয়?

এ কথারও কোনো উত্তর করে না বুলবুলি। তার অতলে গহীন মায়া খেলা করে। আকাশে নীল অপরাজিতা ফুলের রঙ দেখতে পায় সে। শুধু নিজের ভেতরটি দেখতে পায় না। দুঃখ পায়, ভালোবাসতে যায়, মার খায়, অসতর্ক শরীরে ঘুম এসে যায়।

এভাবে যখন বুলবুলি বড়ো হয়ে উঠল, সোমত্ত হয়ে উঠল তখন থেকে সোহাগ-বালা যেন কেমন খিটখিট করে। ভাত জোটে না পেটে। মেয়ে চরে বেড়ায় সাতমুল্লুক। ইমিটেশনের গয়না পরার শখ। একে তাকে পটিয়ে ভি. ডি. ও. হলে পিকচার দেখতে যাবে। ও ঠাটমারানির শখ কত, বুঝবে একদিন—। তারপর যখন চোখ চলে যায় উঠোন তরফে। সে তাকিয়ে দেখে নিজের হাতে লাগানো লঙ্কা গাছটার দিকে। সবুজ টিয়াপাখির স্বরে গাছ ডাকে। সেদিকে তাকালেই দেখা যায়—ফলন্ত গাছের ডাল থেকে কচি লঙ্কা কুমারী মেয়ের প্রণামের মতো নত হয়ে এসেছে—। সোহাগবালার গরম শরীর তখন একটু নরম হয়ে যায়।

জলের নিয়মে দিনটি গড়িয়ে যাচ্ছে। লোকটার দেখা নেই। সত্যি একটা ডাকাত। একটু পরে এসে বউয়ের কাছে তম্বি দেখাবে,—ভাত দে। না দিতে পার চুলের মুঠি ধরে মারবে—।

গর্ভবতী একটি ডোমচিলের কান্নার মতো ভারি অন্ধকার ছড়িয়ে যায় চরাচরে। কাঁসাই নদীর কূলে আঁধার ঘন হয়ে ওঠে। কৌশল্যাবস্তির লোকজনদের চোখের পাতা লাগতে শুরু করবে এবার। মানুষজনের বিলাপ, বচসা শুনতে পাওয়া যায়। সোহাগবালা চিৎকার করে ডাকে, বুলবুলি, ও লো মাগী, বলি গেলি কুথায়? সে ডাক শুনে নিকটবর্তী আঁধার চমকে চমকে ছিঁড়ে যায়। মায়ের বুকের দুধ শিথিল হয়। যেন বাতাসে বাতাসে ধাক্কা লাগে। ডাক শুনতে পায় না মানুষ। কেউ কেউ কাণ্ডজ্ঞান হারায়।—কিংবা এও হতে পারে ডাকটি শুনেছে বুলবুলি কিন্তু সাড়াটি দিল না। এই তার চরিত্র। শুধু লুকিয়ে রাখবে সব কিছু। অন্ধকারে ছুটে দৌড়ে দিশাহারা এই ডাক হোঁচট খেল মাঠে, ঘাটে, বৃক্ষ চরাচরে। কেউ সাড়া দিল না।

পাশের ঘরেই সমবয়েসী সুজনী থাকে। বুলবুলির সই। সোহাগবালা তাকে গিয়ে জিজ্ঞেস করে—মাগী গেল কোনদিকে?

তার আমি কি জানি—ঠোঁট বেঁকিয়ে গতর দুলিয়ে ফিগার দেখাল সুজনী। কে কার সঙ্গে যাবে তা আমাকে এসে খুঁচাও কেন বল দিকিনি। তোমার বুলবুলি সে কি আর ছোটোটি আছে।

গাঢ় অন্ধকার নীরব কাকের মতো স্থির হয়ে গেল। সোহাগবালার মুখে ভাসে বুলবুলির মুখ। লক্ষ্মীকান্ত এমন মুখ বাংলাদেশের ঘরে ঘরে আছে যাদের গুণের ঘাট নাই। ইদানীং সোহাগবালা টের পায় মনটি মেয়ের গভীর জলের মাছ—গহীন লোকের বাসিন্দা। যখন হাসবে তখন ভাসবে আর ডুবে ডুবে জল খেলে লক্ষ্মীনারায়ণের বাবাও টের পাবে না। প্রেমে দুঃখে মেয়ে যে আত্মঘাতী হবে

তা-ও না। শুধু ক্ষতবিক্ষত দাগ নিয়ে ঘরে ফিরে এসে বলবে, চেঁচাও ক্যানে। তখন পাতাল রহস্য টের পায় এমন মানব জন্মেছে নাকি এ ভুবনে।

কোথায় নেশা করে পড়েছিল কে জানে। জনার্দন ঝাঁকড়া চুলে ঘরে এসে ঢুকল। চোখ দুটি তার রক্তজবার মতো লাল। কষাটে চেহারা, ধানপাতাতুল্য সূচ্যগ্র চোয়াল—মারাত্মক ধারালো। আর আকাটা পিঙ্গল দাড়ি। সে এসে সোহাগবালার দিকে চোখ করে বড়ো বড়ো ঢেকুর তুলে বলল—চেঁচাও ক্যানে, চেঁচাও ক্যানে। গলা তো নয় যেন কাঁসর ঘণ্টা বাজে। মেয়া যদি সন্ধেবেলা একটু এদিক ওদিক যায়ই তবে চেঁচিয়ে জগৎ সংসার জড় করতে হবে—

তোমার কি? সব্বনাশ হলে তুমি তো শুঁড়িখানায় গিয়ে পড়ে থাকবে। সামাল দিতে হবে তো আমাকে।

হ্যাঁলো মাগী, আমি তো কিছুই করিনি। যা করিচু সব তুই। আর তোর···। —জন্মটা তাদের দিয়ে দেয়লিনি ক্যানে—

এই মুখ খারাব করবেনি বলে দিচ্চি।

ওই, শালির রকম দেখ না, ক্যানে কি করবি শুনি। মুখ খারাব যেদি করি তবে কি করবি।

কি আবার করব। তোমার মতো ডাকাতকে কি করতে পারি আমি! মেয়ার জন্মই দিয়াচ। একটি পয়সা আনবার তো মোরাদ নাই। ঘরকে এলে ক্যানে। কুন চুলায় পড়েছিলে, পড়ে থাকলেই তো পারতে।

এ মাগী চুপচাপ থাক—। —একটা কথা বলতে ঘা কতক দিয়ে দিব গরম গরম, তখন দেখবি।

ঐটি তো শিখেচো। আমি অপেক্ষা করে আছি কবে আগুন উঠবে তোমার মুখে—জুমড়া কাঠ ঢুকবে, আর আমি হায় করব—

কি—এই বলে চোট পায়ে জনার্দন এগিয়ে গেল। চুলের মুঠি ধরে বউকে মাটিতে ফেলে গলায় পা তুলে দিয়ে বলল, দেখবি ছারপোকার মতো টিপে মেরে দিব। নাকি উঠে ভাত দিবি। ভালো চাউ তো আর একটা কথা বলবিনি—

সোহাগবালাকে ছেড়ে দিয়ে জনার্দন দুয়ারের খুঁটিতে ঠেস দিয়ে ঝুম হয়ে বসে রইল। তখন চোখ পানিফলের মতো ঘন রক্তাভ সবুজবর্ণের। তার মানে—নেশা এখনও যায়নি। সোহাগবালাও আর কোনো উত্তর করে না। দাঁতে দাঁত চেপে নিজেকে সংযত করে। নইলে তুমুল ঝড় উঠবে। ভাত বেড়ে দেয়। কাঁচা লংকা কামড়ে আলু চটকা দিয়ে আকালের রাক্ষসের মতো জনার্দন খেতে থাকে।

সবাই তাকে জনা বলে জানে। ডাকাতি কিন্তু সে কোনোদিনই করেনি। ডাকাতি করতে গেলে যে বুকের পাটা চাই তা বোধহয় নাই। ঘরে এক পয়সা এনে কোনোদিন বউয়ের হাতে তুলে দিয়েছে এমন নজিরও নাই। ভাত খাওয়া হয়ে গেলে হাত ধুয়ে জনার্দন আবার এসে বসে সেই দুয়ারে খুঁটি ঠেস দিয়ে। তখন তার চোখের সামনে হিন্দি হট পিকচারের মতো ভাসতে থাকে ফেলে আসা জীবনের ছবি।—গর্ভিণী মাঠ শরীরে পরেছে সোনার গয়না। আদিগন্ত কেমন সাজন্ত, কাঁচা কষা হলুদরঙ রোদের সঙ্গে বেটে গায়ে-হলুদ নিয়েছে কেউ। কেউ আবার ধুলায় কাদায় মাটিতে ছড়িয়ে গড়িয়ে কাঁদছে। এরই নাম ধান। এদের বড়ো মান অভিমান। বয়সে অনুরাগে কারো-বা নাকের ডগা কাঠঠোকরা পাখির ঠোঁটের মতো তীব্র হয়ে আছে। না দেখে পা ফেললেই রক্তপাত। সেই আলপথে একা একা অমানুষ জনার্দন কোথায় যেন চলেছে।

বস্তির খুপরি খুপরি ঘরে কেরোসিন তেলের টেমি বাতি জোনাকির মতো জ্বলছে। বাদবাকি আঁধার। সেই আঁধার ভেদ করে ছুটে ছুটে আসছে একাদশীর বাজনা। আকাশের দিকে তাকিয়ে উন্মুখ হয়ে জনার্দন সেই বাজনা শুনতে থাকে—

তারপর কাউকে কোনো কথা না বলে হুটহাট করে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। চাঁদের আলোটি ক্ষীণ ছিল, কষ মেশানো,—তাই যেন অষ্টাদশী-এলোকেশি আঁধার। ঠাকুর ভাসানে চলেছে। বাজছে জগঝম্প। চোখের সামনে আসে লোক-লস্কর, উর্দিপরা বাজনদার, ট্রলিতে ঠাকুর। জলে পড়বে। হিন্দি গানের সুর বাজছে। নাচছে লোকজনেরা। লাল মোরগঝুঁটি চোখ, আদি মানবের মতো আশ্চর্য চোখে তাকিয়ে দেখছে জনার্দন।

দেখছে ঝলমলে শাড়ি পরেছে ঠাকুর প্রতিমা। ডাকের গয়না, নাকে নোলকে সোনার মতো ঝকমকা। সেই ভাসান-দলে ভিড়ে গিয়ে নাচতে নাচতে নদীর দিকে এগোতে থাকে জনার্দন। যেন সে এক অলৌকিক মত্ততার ভেতর দিয়ে শান্ত ও বিস্ময়কর পৃথিবীর ওপর দৌড়াদৌড়ি করে। তার পা টলে, শরীরে অবসাদ, জলের টানে ছুটে যায় সে। পাগলা জল যেন তাকে টানতে থাকে। জগৎ আর জীবনের সমাহার এই যে মানুষটি সে আর পুরানো জনার্দন নেই। নিজেকে জানে না চেনে না, এমনকি সোহাগবালার সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই।

সোহাগবালার ভাগ্যটাই এই। হেরে যাওয়া মানুষের মতো ফ্যাকাশে হয়ে বসে থাকে সে। বড্ড জেদি—ভেতরে রাগের খেলা চলে—। স্বাস্থ্য বেশি তাই

হাঁসফাঁস করে। মেয়েটা যে আপনার হবে,—পেটে ধরেছে কালসাপ। সে ঘরের খাবে আর বাইরে মুখ বাড়াবে।

একা একা যম আঁধারটি হজম করতে পারে না—দূর থেকে ভেসে আসে শুয়োরদের ঘড়ঘঙ্ আওয়াজ। কেউ কোথাও কাউকে মা-বাপ তুলে গালাগাল করছে। সোহাগবালা—ভগবানের কাছে নিজের মৃত্যু কামনা করে। এত লোকের মরণ হয়, শালা আমার মরণ নাই।

এই সব ভাবতে ভাবতে চোখে ঘুম এসে গেল। ঘুমের মধ্যে সে দেখল জলের ভেতর নেমে গিয়ে জনার্দন ভাসানের ঠাকুরের অঙ্গ থেকে কাপড় খোলার বদলে তার গা থেকেই শাড়িটা টেনে খুলে নিচ্ছে। লোকটা ডাকাত। চমকে ঘুম ভেঙে গিয়ে সোহাগবালাকে আরো স্থির করে দিল। শ্বাসনালিটাকে টিপে দিল যেন কেউ। উঠে বসে, হাঁটু মুড়ে—গলায় হাত বুলিয়ে দেখল সে।

একটা লোকের সঙ্গে গল্প করতে করতে বুলবুলি চলে এসেছিল নদীধারে। পশ্চিম আকাশে তখন গরম জিলিপির মতো নিভন্ত আলো। ইটভাটাটি জ্বলছে আগুনে—কাঁচা নরম ইট পুড়ছে। মোটরবাইকটা দাঁড়িয়ে আছে একটু কাত হয়ে। রাজদূত। লোকটা বলল—পেছনে বসে পড়।

ওমা—কোথায় যাব—বুলবুলির চোখে যেন পশ্চিম আকাশের বিষম মেঘ। শাড়িটা কোমরে গুঁজে নিয়ে উঠে বসল সে। তাকাল বার কয়েক—চোখে ছল। দূরে দেখা যায় সাউথ ইস্টার্ন রেলপথ। এইখানে কালে কখনো এসে দুঃখী মানুষজন লাইনে মাথা দিয়ে যায়। জীবনে অবসান আসে।

শুধুমাত্র বাইকটা স্পিড নিয়েছে। বুলবুলির ভরা গতর হ্যাঁচকা টানে গিয়ে পড়ছে লোকটার পিঠে। বুকের ভেতরটায় উড়পুড় করছে কি একটা। যেন ভরা-দুধের উপর সর জমতে শুরু করল এবার। লোকটা কণ্ট্রাক্টর—উচিত মতো পি. ডবল্যু. ডি. রিলিফের টাকা রেখে রাস্তাঘাট কাটে। মেরামত করে। তার সঙ্গেই চলছিল বুলবুলির মন মেরামতের খেলা। সে বলল—কোথায় যাব—

সিনেমা দেখবি—?

ন্না—

তবে—! হোটেলে বসে মাছ ভাত খাবি? পাঞ্জাবী ট্রাকবালাদের ঢাবা-হোটেল। —মাটন তরকা আর রুমালি রুটি—

দু-দিকে তাকিয়ে বুলবুলি দেখল কালো কালো জামফলের মতো সন্ধ্যা

নামছে টুপটাপ করে। আঁধার ঝরছে। আকন্দ আর সেওাকুলের ঝোপে গিয়ে সেই আঁধার রাক্ষস হয়ে উঠছে। তারপর বহু যোজন মাঠ। ছোট্ট ঝুপড়ি। কংসাবতী নদী যৌবন হারিয়ে এখানে কাঁসাই নামে পরিচয় দিয়েছে। সেই নদীর গায় ছোট ঝুপড়ি—বেশ্যারা ঘর-সংসার করে।

বুলবুলি চুপ থাকে। বয়স ধৌত তার শরীর এখন যেন উচ্ছৃংখল সাপিনীর মতো প্লাবিত। উদ্ধত। রহস্যময়। সে জানে এই লোকটা থাকে নিউ ডেভালাপমেণ্ট রেলওয়ে ক্যাম্পাসের পাশের বস্তিতে। বড়ো ঘোরালো সেই বস্তির রাস্তা। পথ—ছোটখাটো কাঁটায় ভরা, সি. পি. এম.-এর বাঁকা কাস্তেটির মতো ধার। গহীন গাঙ কিংবা মেয়েমানুষের মনের মতো জটিল পথ। রেল, রাজনীতি, গুণ্ডা, আচ্ছা আচ্ছা আদমির সঙ্গে লোকটার সাঠ আছে। তার আধপাকা চুলগুলি ভাবে, আনন্দে নাকি উদ্দামতায় থরথর করছিল। কিংবা তা আসলে নয়, মোটরবাইকের উড়ন্ত হাওয়া তার চুলের গভীরে রহস্যময় হয়ে উঠছিল। মাঝে মাঝে গল্পই শুনেছে বুলবুলি—ধরতে জানলে টাকা উড়ে আসে হাওয়ায়। সেই হাওয়া কেটে কেটে দুদিক মুখরিত করে ছুটল কাল্টির মোটরবাইক। এমন সময় বুলবুলি যেন শুনতে পেল—বুলবুলি-ই-

সোহাগবালা ডাকছে। হাঁকছে। সেই বাজনিনাদটি যেন সুদর্শনের মতো ঘুরছে পৃথিবীময়। কিন্তু বুলবুলিকে ছুঁতে পারে না। এখন রাবণের সঙ্গে সীতা—। বুলবুলি শুধু ভাবল, টাকা—

হিসাবের সেই কথাটি কাল্টি শুনল কি শুনল না—তার হাসি বাঁশবনের ফাটা বাঁশের মতো বেজে উঠল হাওয়ায়। আমবাগানের ঘন আঁধারের ভেতর দিয়ে খড়্গপুর শহরতলির আরেক পল্লী ট্যাংরা। পয়সার জন্য বুলবুলি যেন লালায়িত হয়ে উঠল। অবাক শীতে কিংবা জাগতিক জীর্ণতায় তিরতির করে কাঁপছিল তারও শরীর। তার প্রথম যৌবনকাল। আকাশকে প্রফুল্ল দেখাচ্ছিল। এমন সময় কোথা থেকে বাতাসে মাছভাজার গন্ধ ভেসে এলো।

অত রাতে আমি ঘরে ফিরব কি করে—

কেন, যেমন করে যাচ্ছিস তেমনি বাইকে চাপিয়ে তোকে ঘরে ছেড়ে দিয়ে যাব—

লাল কাঁকুরে মাটির ঢালু বেয়ে মোটরবাইক নেমে যায়। চারজন লোক বেরিয়ে আসে। উত্তেজনাটা ধীরে ধীরে তিথিয়ে যায়। মোটরবাইক থেকে নামতে গিয়ে যেন আটকে যায়। বুলবুলির পা। কুহক বিচলিত করল প্রাণকে। বুকে

গুড়গুড় শব্দে মেঘ, যেন পদ্মপুকুরের তলায় লুকানো কৌটোটা থেকে জীবন্ত ভোমরটি ধরে নিয়ে যেতে এসেছে ওরা। এমনই চোখ।

কাল্টি বলল—এরা সব ভালো লোক। আচ্ছা আদমী।

কাল্টিকে ভালো লাগে বুলবুলির। সে ওর কাঁধের দিকে তাকায়। নির্ভয় চায়। কাচের চুড়ি, কাজল, আলতা এই সব কিছুকেই বুলবুলির অকস্মাৎ অন্য-রকম মনে হয়। সে তার হাতের দিকে তাকায়। বুকের দিকে চোখ ঘোরায়। নদীর বাতাসের বদলে এখানে শূন্য আকাশ শরীরে এসে ধরা পড়ে। মন ব্যাকুল হয়। চতুর্দিকে অনিচ্ছা ছড়িয়ে আসে। এ পাড়ায় পুলিশ আসে মাঝে মধ্যে। গাড়ির পোড়া তেল কমদামে বিক্রি হয়।

চারটি লোক চাররকমের কথা বলাবলি করছে। তর্কাতর্কি করছিল সি. পি. আই-সি. পি. এম-এর গণ্ডগোল নিয়ে—লড়ালড়ি করছে নারায়ণ চৌবে আর যতীন চক্রবর্তী—দূরে দাঁড়িয়ে নখ বাজাচ্ছে কংগ্রেস, জ্ঞানসিং সোহনপাল। ছাগলের মাংস। দাদের ওষুধ। ইলেকট্রিক অফিস আর লোডশেডিং নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল। বুলবুলিকে দেখামাত্র সব চুপ হয়ে ওঠে। চলতে লাগল শুধু চোখ চাওয়াচায়ি।

দুই হাতের কারসাজিতে থাবড়ে একজন খৈনি ঢোকাল ঠোঁটের চেপায়। লোকটা রিক্সাচালক ইউনিয়নের চেয়ারম্যান। সে কাল্টিকে বলল—মুনিয়া পাখি।

বাকি তিনজন হেসে উঠল। ইট ছোঁড়ার শব্দে তারা হাসে। হাসিতে ধস্তা-ধস্তির আওয়াজ। সব নওজোয়ান। এখন দু পয়সা কামিয়ে খাচ্ছে।

বুলবুলির নিজের ভেতর ছরছর শব্দে বৃষ্টি আরম্ভ হলো, তবু যেন সে মরিয়া। বিপদে পড়লে বিপদ—না পড়লে—। একটি জোড়-পুকুরের পাড়ে এসে দাঁড়াল সবাই। কাল্টি বলল—সব আমার বন্ধু।

বুলবুলি হাসল। যেন তার খাটো শাড়িতে টান পড়ল।

সব বলছে বসে একটু মদ খাবে, মৌজ করবে।

বুলবুলি ফের হাসল। এবার তার হাসি মৃত পায়রার মতো সাদা।

কি হলো, মুখ যে কালো হয়ে গেল—

এই কথায় মেয়েমানুষের মুখ থেকে ম্লানিমা ঝরে গেল—দাউ দাউ আগুনে যেন সে জ্বালিয়ে নিল নিজেকে। অন্তত চেষ্টা করল। ভয় বললেই ভয়। তাই শারীরিক কষ্টের বাইরে বেরিয়ে এসে সে অন্যরকমের হাসি হাসল।

যারা হাঁটছিল তাদের কারো দেহ ইস্পাতের মতো শক্ত। গলার শিরাগুলি লাইট পোস্টের তারের মতো তীব্র। তারা পা ফাঁক করে হাঁটে। রঙ কালো। মেয়েমানুষ অপরিচিত হলে ফিসফিস্ করে কথা বলা এদের স্বভাব।

বুলবুলি এদেরই মাঝে যেন দৌড়-ঝাঁপ করতে করতে এগোতে লাগল। লাল রঙের ভারি মোটরবাইকটা দূরে পড়ে রইল একা।

একটা বকুল গাছে ঠেস দিয়ে জনার্দন। মাঝখানে নদীর তরল জলে রুপার লীলা। এ-পারে ও-পারে দু পারেই চলছে নিরঞ্জনের আখড়া। এ-পারে খড়্গপুর। ও-পারে মেদিনীপুর। কাঁসাই নদীর দুই কন্যা—চোখে তাদের মমতার জল টল্‌টলায়।

ঘর থেকে জনার্দন যখন বেরিয়ে এল তখনই তার পিছু নিয়েছিল একটা কুকুর। কুত্তাটা ভয়ডরহীন। আঁধার, নদীধার জ্ঞান নেই। ঠাকুর ভাসাতে এসেছে শ'য়ে শ'য়ে লোক—সেই হ্যাজাকের আলো। বাজনার ঢ্যামকুড়াকুড়। মানুষের নাচনকোঁদন। প্রতিমার যৌবনে গর্জনতেলের লীলা—সবকিছুই দেখতে দেখতে নিজের রক্তে সে যেন গভীর রাতের চিকন বাঁশির স্বর শুনতে পেল। আর হাঁ করে তাকিয়ে থাকল নদীর দিকে চেয়ে—

হয়ত সেখানে সেই নদীর ধারের পলি মুখরিত মাঠে এখন অন্য ছবি। নবীন ধান গাছকে জড়িয়ে মাটিতে শুয়ে আছে হয়ত একটি নাতিদীর্ঘ সাপের খোলস। সাপ নেই, সে হয়ত উধাও হয়ে গেছে। সে জানে দুধ ফুরিয়ে চাল ধারণ করছে বুক। ধানের বুকে এখন ভাতের তোড়জোড় চলছে। আবার আগামী সিজিনে বুঝি কাঁচা দুধে এসে বসবে সাপ। তাই নদীধারের রূপ এখন কোন্ অরূপে ধায়!

পৃথিবীতে কোথাও কোনো দুঃখ নেই। কাঁটাগুলি ভোঁতা হয়ে গেছে—তাই খচখচ করে বেঁধার বদলে ফুলের মতো আলো। ক্ষিদে ভুলে গেল কুত্তাটা—সে তাকাল জনা ডাকাতের দিকে। জনার্দন দেখল—নদীতে প্রতিমা পড়ছে। লাল নীল হলুদ বেনারসীতে মোড়া চিরকালের ঠাকুরগুলি ফুলে চন্দনে ঝপাংঝপ শব্দে নদীতে গিয়ে পড়ছে। মিঠে ক্লারিওনেট, তাসা বাজছে। আত্মীয়ের মতো মহা আদরে ডাকছে স্বর। নেশায় পাওয়া মানুষের মতো এক দৌড়ে জলে লাফ দিল জনার্দন। কুত্তাটা কুঁই কুঁই করে উঠল। একের পর এক মেড় পড়ছে জলে—সিংহ-বাহিনী চালচিত্র অন্তঃসলিলা হচ্ছেন। কে একজন চেঁচিয়ে উঠল—এ জগা—জগা রে—এ—এ—এ—। জনার্দন জল কেটে কেটে বহুকালের পুরানো মাগুর মাছের মতো স্বর্ণশক্তিতে মাঝামাঝি জায়গাটিতে চলে এসেছে। এবার দুদিকে

যেদিকে হাত বাড়াও হাতে পড়বে জলে ডোবা মরা ঠাকুরগুলির নিস্তেজ নেতিয়ে পড়া দেহ। যেন উদ্ধার করতে এসেছে এইরকমই একটা ভঙ্গিতে হাতড়াতে থাকে জনার্দন।

এখন জলের তলায় ডুব সাঁতারে খেল ধরল সে। জল কম—মাঝ বরাবর বালি পড়েছে বেশ। নৃসিংহ অবতারের মতো নিজের দুই জানুতে টেনে আনা ঠাকুরের দেহ—দু ভাগ করে জনার্দন। খোঁপা থেকে চুল খসে যায়। মাঠের মাটির থেকে যেমন রোদ চকলা ওঠে তেমনি রঙ ঝরে যায় প্রতিমার মুখ, বুক, যৌবন থেকে। খসে পড়েছে হাতের অস্ত্র, দেহের অলংকার। পায়ের গোড়ালি, থুতনি, ডুবে আছে জলে। যেন মহাধর্মের বহুমূল্য সেই সোনার আংটিটি নিজের অসাবধানতায় জলে পড়ে গেছে। এখন অবহেলায়। অযতনে। মাছেদের চুমু খাচ্ছে অলৌকিক ঢঙে—গহীন পাতালে। কিন্তু আজ হিন্দি ফিল্মের নাটকীয় গল্পের মতোই নেমে এসেছে কেউ—একটি মানুষ। দেবীর অঙ্গে ঝলমলে ঝলমলে পোশাকে গিয়ে তার চোখ পাথর হয়ে যায়। যেন ঠিক চোখ নয়, জলে ভরা অন্য এক ভুবন বরফের মতো স্ফটিক হয়ে আছে।

অন্ধকারে জলের মধ্যে কেমন দুপ দুপ শব্দ হয়—পা ছোঁড়া-ছুঁড়ির খেলা চলে। জলের নিচে পড়ে থাকা এক একটা পাটাতন, মেড়—যেন ঘরবাড়ির আকার ধারণ করে। জলজ গাছ, উদ্ভিদ এইসবকে বৃক্ষ বলে মনে হয়। এখন এ এক আলাদা জগৎ দৃশ্যমান হয়ে ওঠে ব্রহ্মাণ্ডের অতলে—নিহিত পাতালছায়ায়।

ওপরে রয়েছে যে জগৎ সেখানে বউ, মেয়ে, ঘরসংসার। বস্তি, ট্রেন লাইন—মুক্ত আকাশ। বাপ মায়ের মায়ার জগৎটি। জনার্দন চারিদিকে তাকিয়ে দেখে—জলডুবি যাওয়া ঠাকুরের গায়ের পালিস করা লালরঙে হাত পড়ল তার। তরল রক্তের মতো থলথলে লাগল। যেন সত্যিকারের মানুষ-শরীরে হাত পড়ছে তার। নগ্ন হচ্ছে কেউ। ভালো করে তাকিয়ে দেখতে গেল জনার্দন—একটি অনামী মাছ ছুটে এল তার সঙ্গে দেখা করতে। বউয়ের নাকছাবির মতো রুপালি তার গতর। সেই আঁশ অলৌকিক চোখের সামনে এলে জগৎ সংসারকে ফর্সা মনে হয়।

সময় চলন্তা—টেনে টেনে প্রতিমা থেকে কাপড় খুলতে থাকে জনার্দন। কাঁচা পলিমাটির স্তন আরও নরম হয়ে তার হাতের মধ্যে উঠে এল। মাটি পেল মাংসের চরিত্র। এক মুহূর্ত বিহ্বলতায় নাকি ভয়ে থমকে গেল জনার্দন। তারপর আবার যন্ত্রের মতো চলতে লাগল তার হাত।

পাতাল রহস্য এখন অবাক করা। কখনো সুন্দর। কখনো ভয়ংকর। সেই

মুহূর্তে বুঝি কিছু মাছ শিক্ষণপ্রাপ্ত সাঁতারুর মতো ধেয়ে এসে সব কিছু লাবডুপ করে দিল। তারপর স্থির হলো জল—স্ফটিকের মতো তাপহীন আচ্ছন্ন আলোয় জলের গভীরে হাঁটতে লাগল জনার্দন। দস্যুর মতো তার হাত জলে পড়ে থাকা মূর্তিগুলিকে নগ্ন করতে লাগল। মাঝে মধ্যে একমুখ জল নিয়ে বুড়বুড় করে শব্দ করল। জলের নিচে পাতলা, বিচ্ছিন্ন, শ্যাওলারা এসে লাগল তার গায়ে—তাকে আদিমানবের মতো প্রাগৈতিহাসিক রূপ দিল। জনার্দন কিন্তু জানতে পারল না এই পট পরিবর্তন। সে কাপড় চোপড় নিয়ে দ্রুত পৃথিবীর দিকে উঠতে যাবে—এমন সময় একটা ট্যাংরা মাছ ছুটে এসে যন্ত্রণা দিল তাকে। সে শুনল—তুমি কাঁনছ জনার্দন?

ক্যানে, ক্যানে কাঁনব কেনে—

তবে চোখের তলায় বইছে কি—?

আজ খুব নেশা হইচে গ—

নদীর পাড় থেকে কুত্তাটার বাজ-নজর এসে পড়ে জনার্দনের উপর। কলাপাতার গায়ে ঘি লেগে আছে। পাকা কাতলা মাছের মতো কালো শক্ত দুই উরু জলের মধ্যে ঘুরপাক খায় অনবরত।

সরসর করে আকাশে চাঁদ পশ্চিমে ধায়—কি ইশারা পেয়েছে সেই জানে। বাজন থামে। লোক ফাঁকা হয়। উদলা হয়ে পড়ে আছে মানুষের পূজার ঠাকুর। তীর ধনুক। মঙ্গলঘট। আমের পল্লব—ভালোবাসার ভগবান। জনার্দনের নেশা কাটতে থাকে, ফিকে হয়। রাত তার মহিমা হারাতে হারাতে ক্রমে যেন শূন্য হয়ে যায়।

সোহাগবালা ঘরের ভেতর—রাগে দুঃখে জ্বালায় মাঝে মধ্যে খক খক করে কেশে একটু ঘুমিয়ে পড়েছিল। সত্যি সংসার মানুষকে কখন কোথায় নিয়ে গিয়ে ফেলে, কোন বিপথে। স্তব্ধতার ভেতর দিয়ে কখন কিভাবে হৃদয়ে গভীরতা বাজে। নেশা লাগে জীবনে। ছোটো ছোটো পরিচয়গুলি এসে ভিড় করে—মানবজীবনকে বাজিয়ে দেখে।

নিশাভর রাত—এমন সময় মোরগশালে মুরগা মুরগির কাউচাকাউচিতে তার ঘুম ভেঙে যায়। সে তাকিয়ে দেখে কেউ ফেরেনি। না মেয়েটা, না লোকটা। ছলছলিয়ে ওঠে চোখ—।

এমন রাত হামেশাই হয়—সে একা। বোকা। অসহায়। কত সাধের মেয়েটা

তার নষ্ট হয়ে গেল। রাতের পর রাত বাইরে থাকে। কখনও ভোরবেলা ঘরকে ঘুরে আসে। যারা এসে নিয়ে যায় এক সময় তারাই ফেরত দিয়ে যায়। একটা মুরুব্বি লোকের অভাবে সোহাগবালার সংসারটা যেন তছনছ হয়ে গেল। দাঁতে দাঁত চেপে সোহাগী নিজে নিজেই যেন বিড়বিড় করে বলতে থাকে—ভাত দুব। ভালো করে ভাত দুব তোদের কাল থিক্যা। আয় দিনি—দেখি—।

ঝুম আঁধার ঘরের ভেতর। লোকটা কোথায়, বারোয়ারি তলায় শুয়ে আছে নাকি? নাকছাবির পাথরের মতো স্ফটিক আঁধারে চেয়ে আছে কেরোসিন তেলের টেমি বাতিটা। তবু তাতে আঁধার ঘোচে না। হাঙরের চোখ—যেন কলজে, দাঁত, মাংস, পাখনা সব খুবলে খুবলে খেতে চায় এই শকুনি আঁধার। নিজেকে প্রবোধ দেয় সোহাগী—ভালোমন্দ আবার কি, বেঁচে থাকাটাই হলো আসল কথা। চোখ বন্ধ করে ঘুমিয়ে পড়তে চেষ্টা করল সে।

বাইরে আকাশের নিচে টাঙানো তারে বুলবুলির নীলকণ্ঠ শাড়িটা কেচে মেলে দিয়েছিল। শুকোতে দিয়েছিল। তোলা হয়নি। হিমে ভিজে গেল যে। —ও মর—মশার মুখে আগুন। শুধু কামড়ানি।

জানলার দিকে তাকিয়ে সোহাগী দেখল তার কপালের মতো বাঁকা একফালি চাঁদ উঠেছে এতক্ষণে। আহা রে, ই কি সগাল হয়ে গেল!

হঠাৎ খুটখুট করে দরজা ঠেলার শব্দ—। কে—কে র‍্যা—চেঁচিয়ে ওঠে সোহাগী। ধড়ফড় করে উঠে বসে দেখে এককাঁড়ি ভিজে কাপড় বুকে আকড় করে ধরে জনার্দন ঘরে ঢুকল। উঠোনে ধপ করে ফেলে দিয়ে হাঁসফাস করতে লাগল সে। অস্ফুটে সোহাগীর গলা থেকে বেরিয়ে এল—অ—। ব্যাজার মুখে চুপ হয়ে যায় সে। কাচাকুচি করতে হবে তাকেই। কিন্তু সংসারের কাজে লাগবে না এই টাকা। ভাটি-খানায় যাবে। মদের দোকানে যাবে। শুধু উচিৎ মতো মার খাবে সোহাগবালা।

আকাশ ফাঁকা। আঁধার উধাও। আলো ফুটিফুটি চৌদিকে। বকুলফুলের মতো ছোট ছোট আলো। ময়দাগুঁড়ির মতো বিন্দু বিন্দু আলো—উঁইপোকার বাচ্চার মতো চালবিন্দু এই আলো যেন পাহাড় প্রতীম এক উঁচু বিশাল পৃথিবীর গায়ে মাথায় পড়ে আদরে ভালোবাসায় ছটফট করে। আস্তে ধীরে আলোকময় যেন মুখ বাড়াবে এখনই এমনি একটা ভাব।

সোহাগবালা তীব্র, ঋজু, স্পষ্ট গলায় বলল—আবার এনেছ? কতধার না তোমাকে বলেছি ওই পাপের কাপড় আমার চাই না। ওই হাতে যে টুঁটা হবে গো তোমার। তোমার কি পাপ পুণ্যে জ্ঞান নাই? হ্যাঁ গ—জ্ঞানপাপী—

জনার্দন কোনো জবাব দেয় না। পাতাঝরা মরা নিম গাছের মতো চুপ। নেশা ছুটে গেছে পাগলা জলে। স্বাভাবিক মাথায় সে কখনও চিৎকার করে না, বউকে মারে না। চুপচাপ শান্তিপ্রিয় একটি শালুকফুলের মতো ফুটে থাকে।

সোহাগী মুখ ঝামটায়—কি হবে আমার ওই ক'টা টাকা। সংসারে সব্বনাশ ঢুকবে—

জনার্দন ক্লান্ত, শ্রান্ত, স্থবির।

এমন হামেশাই হয়। চিৎকার চেঁচামেচি বাড়ালে লোক জানাজানি আরও বাড়বে। তার চেয়ে চুপ হয়ে যাওয়া ভালো। কি বলবে জনার্দন। শুধু শাসনই করে যাবে সারাটা জীবন! শুধুই চোটপাট করে যাবে? বাপ হয়ে বাপের কর্তব্য তো সে কোনোদিন করল না। ভালো ভালো কথা বলতে, আদর করতে পয়সা লাগে না তাই-না সে অসংকোচে মেয়েকে মাথায় তুলল—। দুয়ারে পাতা ছিল একটা মাদুর। গিয়ে শুয়ে পড়ল জনার্দন। বলল—ওগো শুনচ—

কি?

কাপড়গুলান রোদে মিলে দিবি। আমি একটুন ঘুমাচ্ছি। শুকনা হয়ে যাবে এক মম্বরেই—পাতলা শাড়ি কাপড়। থাক থাক ভাঁজ করে লণ্ড্রীবালাকে দে এসবি। ইস্ত্রি করে রাখবে। ঘুম ভাঙলে—খেয়ে দেয়ে আমি গোলবাজারে অন্নপূর্ণা বস্ত্রালয়ে দে আসব।

আকাশ একেবারে ফাঁকা হয়ে যায়। একবিন্দু ত্রুটি নেই কোথাও। শুধু ভোরের শীতে কাতলা মাছের আঁশের মতো সাদা হিম লেগে আছে। উড়ে গেছে পাপ। নরম হয় সোহাগবালা—ঘাসের মতো মেয়েমানুষের মন। মুখে মিঠা আনে। শুনতে পায় মেদিনীপুর ট্রেন লাইন ধরে ভোরের পুরুলিয়া এক্সপ্রেস খড়্গপুর ঢুকছে। সোহাগী বলে—মায়ের অঙ্গ থিক্যা কাপড় খুলে আনতে তমার ডর লাগেনি—হ্যাঁ গ—এই দস্যুর কাজ কোথায় শিখলে বল দিনি? সেদিনে বললে, ছেড়ে দিবে—ত কি হ'ল? ছেড়েই দাও না এই পাপ কাজ।

রাত্রি তখন অবসান প্রায়। লোকটা চিনতে পারল তার বউকে। বহুকালের পুরানো হত ব্যবহারে জীর্ণ একটা মেয়েমানুষ মাত্র। ভালোবাসার মানুষ। বস্ত্রখণ্ডের গায়ে তার শুধুই ছোপ—মহাজীবনের কালিগুলি দাগ এঁকে বসে আছে।

তখন সামনেকার বাঁশবন থেকে প্রথম প্রত্যুষের ডাক এল।

জনার্দন চুপ হয়ে যায়—তার মাথায় এই ভুবন ক্রিয়া-কাজ করে না। বরং শীতের ক্রিয়া চলে। কদম কাঁটার মতো রোমকূপ জাগে। ভেতরের ফুলটি হিম হয়ে

ফুটতে থাকে। বকনা বাছুরের মতো অবলা চোখে সে যেন বউয়ের দিকে তাকায়—। প্রথম যৌবনে কি খেয়ালে জলে ডুবে গিয়ে প্রতিমার কাপড় খুলে এনেছিল সে কাহিনী আজ অন্তরালে হারিয়ে গেছে। তখন ইটপাটের বয়স—জলে নামলেই নিজেকে যেন সর্বশক্তিমান মনে হতো। নিজেকে যেখানে সেখানে ছুঁড়ে দেওয়া যেত। তারপর নেশা ধরে গেল। অভ্যাস আর কি। কাপড় খুলে এনে রোদে শুকিয়ে ইস্ত্রি করে দোকানে দিলেই টাকা। গাছে ফলে যে টাকা তা যেন তলায় পড়ে আছে—কুড়িয়ে আনলেই হলো। কিন্তু বয়স যতই বাড়তে লাগল—ভগবানের অঙ্গে হাত দিতে গিয়ে ততই যেন হাত কাঁপতে লাগল জনার্দনের। পাপের ভয় মানুষের—এ যেন আদিকালের সংস্কার। সে যদি ভারতবাসী হয়। বয়স যত বাড়ে এই সময়টি ততই যেন কাল বিষধরের মতো মাথা তুলে জাগে। এখন নেশা না করলে আর জলে নামতে পারে না জনার্দন। ভয় লাগে।

সোহাগী বলে—ভিজা কাপড় তো, জল ঝরে যাক। চিপে চিপে নিঙুরে রোদে দিয়ে দিব। —নাও তুমি, একটু ঘুমিয়ে নাও। একেবারে সকাল হয়ে গেল—

নানান রকম চিন্তা হচ্ছিল জনার্দনের। এই পাপ কাজ না করাই ভালো। কি হবে। এই সব ভাবতে ভাবতে তার ক্লান্ত চোখদুটি ঘুমে ভারি হয়ে উঠল। জ্বালা করছিল চোখের ডোবা। এবার ঘুম ধরে গেল—

এমনি করেই আদিমানবের চোখে একদিন ঘুম এসেছিল। প্রাগৈতিহাসিক পৃথিবীর সংসার মহিমা থেকে সরে গিয়ে ঘুমের ভেতর অন্য জগৎ আবিষ্কার করেছিল মানুষ। মাঝে মাঝে সেই জগৎ আর এই জগতের মিলন ঘটত—একটি মাত্র শব্দে। ঘুম ভেঙে খান খান হয়ে গেলে মানুষ টের পেত এই জগৎ অলীক, রহস্যময় সত্যহীন।

তেমনি একটি শব্দে ভেঙে গেল জনার্দনের ঘুম। কে যেন কঁকিয়ে কেঁদে উঠল। ধড়ফড় করে উঠে সোহাগবালার কাছে গেল জনার্দন, বিদ্যুৎ পীড়িত লৌহদণ্ডের মতো চমকে উঠল সে। পাথরে কোঁদা কোনো বৃদ্ধের মুখের গড়ন এখন স্থির হয়ে গেল।

সোহাগবালা কাপড়গুলি নিঙড়ে নিঙড়ে তারে মিলে দিচ্ছিল। হঠাৎ সেই শাড়ি-কাপড়ের গাদা থেকে একটি শাড়ি তার হাতে উঠে এল। চমকে তাকিয়ে ভালো করে দেখতে গিয়ে কঁকিয়ে কেঁদে উঠেছে সোহাগী। তারপর সেও চুপ—স্থির—অনড়—

(গহীন পাতাল থেকে উঠে এসেছে যা, আদিকন্যা বুলবুলির পরনের শাড়িটি—তারই মায়ায় পড়ে থমকে যাবে নাকি এই জীবনের চলাচল)।

—